দস্যি ডেনিস কমিক্‌স • আমার স্কুল • ছোট ছোট খেলা • নতুন খেলা

২০ ডিসেম্বর ২০২৪

আনন্দমেলা

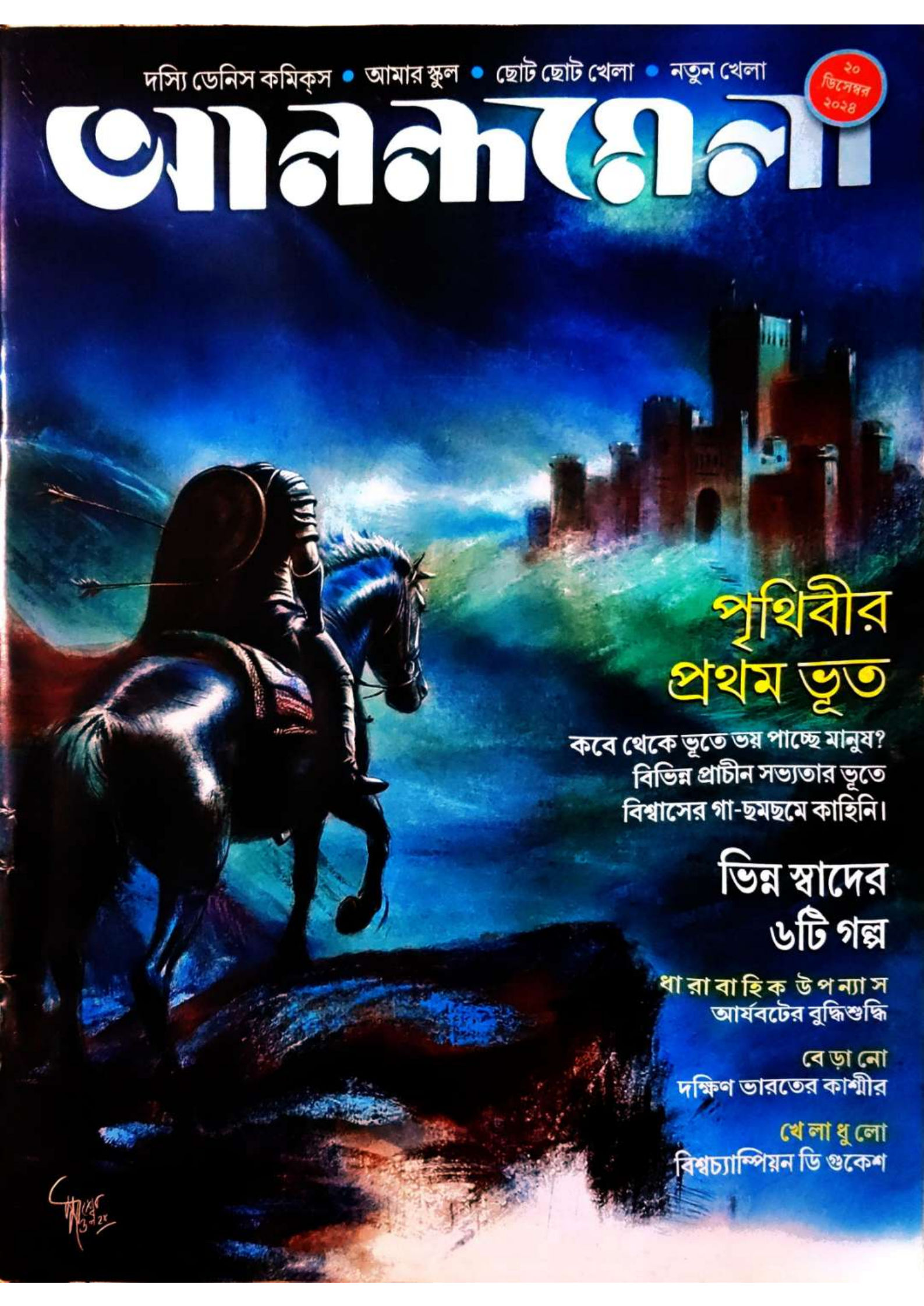

পৃথিবীর প্রথম ভূত

কবে থেকে ভূতে ভয় পাচ্ছে মানুষ?
বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার ভূতে
বিশ্বাসের গা-ছমছমে কাহিনি।

ভিন্ন স্বাদের ৬টি গল্প

ধারাবাহিক উপন্যাস
আর্যবটের বুদ্ধিশুদ্ধি

বেড়ানো
দক্ষিণ ভারতের কাশ্মীর

খেলাধুলো
বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশ

সূচিপত্র

আনন্দমেলা

৫০ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ ৫ পৌষ ১৪৩১

পৃথিবীর প্রথম ভূত ৮

প্রচ্ছদ কাহিনি

কবে থেকে ভূতে ভয় পাচ্ছে মানুষ? কবে এল ইতিহাসে প্রথম ভূতের উল্লেখ? লিখেছেন অচ্যুত দাস

৬টি ভিন্ন স্বাদের গল্প

পটাশগড়ের কাণ্ড
স্বর্ণেন্দু সাহা ১৬

কুয়াশা ঘেরা বাংলোয়
কুবলয় বসু ২৪

মুদ্রা রহস্য
ছন্দা বিশ্বাস ২৮

রবি ও শশী
সমিত রায় চৌধুরী ৩৪

দিশারী
অর্ণবী সাহা ঘোষ ৪০

ইতিহাসের স্বপ্ন
প্রবীর চক্রবর্তী ৪৬

আশ্চর্য

মাটি খুঁড়তেই ইতিহাস
শুভশ্রী মুহুরী ২৭

প্রকৃতি

মেরুরাত্রি: অন্ধকারের পৃথিবী
সুদেষ্ণা ঘোষ ৩৩

আনন্দমেলা এ বার ওয়েবসাইটে: **www.anandamela.in**

কমিক্স

দস্যি ডেনিস ৫৩

নিয়মিত বিভাগ

ফারাক পাও, সুদোকু ৪
যা হয়েছে যা হবে ৫
খুদে প্রতিভা ৬
মজার ঝাঁপি ৩২
আমার স্কুল ৩৮
শব্দসন্ধান, নিজের হাতে ৪৪
আমার কুইজ় ৪৫
আমার ছবি ৪৯
আমার ইচ্ছেমতো ৫২
নতুন খেলা ৫৮

ধারাবাহিক উপন্যাস

আর্যবটের বুদ্ধিশুদ্ধি
কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ২০

বেড়ানো

দক্ষিণের কাশ্মীর লাম্বাসিঙ্গি
সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৫০

খেলাধুলো

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশ
সায়ক বসু ৫৪

ছোট ছোট খেলা
চন্দন রুদ্র ৫৬

প্রচ্ছদ: মহেশ্বর মণ্ডল

সম্পাদক: সিজার বাগচী

দাম: কুড়ি টাকা

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে জাহরা বসরাই কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড সি পি-৪, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর, অসম আর ত্রিপুরার এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

Rs: 20.00

Edited by Caesar Bagchi and printed and published fortnightly by Zahra Basrai on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata-700091

Year 50, Issue 16
RNI Regd No. 27057/75

ফারাক পাও

২টি ছবিতে অন্তত ৮টি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তার পর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো।

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

উত্তর: ৫ জানুয়ারি সংখ্যায়।

গত সংখ্যার উত্তর

১। একটি গাছ ও পাখি যোগ হয়েছে।
২। আঁকিয়ে শিল্পীর হাতে তুলির জায়গায় পেনসিল এসেছে।
৩। ছেলেটির সানগ্লাসের রং লাল থেকে নীল হয়েছে।
৪। পিছনের ছেলেটির টুপির রং বদলেছে।
৫। সামনের মেয়েটির চুলের ফিতের রং বদলেছে।
৬। আঁকিয়ে শিল্পীর জামায় রঙের ছিটে লেগেছে।
৭। সামনের লোকটির মাথায় ঝুঁটি যোগ হয়েছে।
৮। বৃদ্ধ লোকটির চোখে সানগ্লাসের বদলে সাধারণ চশমা যোগ হয়েছে।

সুদোকু

৭		৯	৮		৬	১		২
	৩	৬				৯	৮	
			৯		৭			
১				৮				৬
	৯						৭	
৬				২				৪
			২		১			
	৮	১				৬	২	
৯		২	৬		৮	৫		৩

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এমন ভাবে বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং উপর-নীচে কোনও লাইনে, এমনকি, ছোট-ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে!

১	৮	২	৩	৪	৯	৬	৭	৫
৬	৯	৩	২	৭	৫	৮	৪	১
৪	৭	৫	৮	১	৬	৩	২	৯
৯	২	৪	১	৫	৩	৭	৬	৮
৭	৫	৬	৯	২	৮	১	৩	৪
৮	৩	১	৭	৬	৪	৫	৯	২
২	১	৯	৫	৩	৭	৪	৮	৬
৩	৪	৮	৬	৯	১	২	৫	৭
৫	৬	৭	৪	৮	২	৯	১	৩

যা হয়েছে

মহাকাশে 'প্রোবা-৩'

মহাকাশের পথে

দূর থেকে আমরা সূর্যের যে ছটা দেখি, সেটিই সূর্যের করোনা। এই করোনাকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে ৫ ডিসেম্বর ভারত থেকে পিএসএলভি সি-৫৯ রকেটে চেপে মহাকাশে রওনা দিয়েছে প্রোবা-৩। সূর্যের তেজ যাতে পরীক্ষার কাজে বাধা না হয়, তাই কৃত্রিম সূর্যগ্রহণের ফন্দি এঁটেছেন ইউরোপ ও ভারতের বিজ্ঞানীরা। প্রোবা-৩ তৈরি হয়েছে করোনাগ্রাফ ও অকাল্টার নামের দু'টি মহাকাশযানের মিশেলে। মহাকাশে একটি যানের ছায়ায় বসে অন্যটি করোনাকে পরীক্ষা করবে।

পৃথিবী শুকোচ্ছে

পৃথিবী

ভূগোলের পাতায় নিশ্চয়ই পড়েছ— পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। কিন্তু এই বৃদ্ধ পৃথিবী তো আর আগের মতো নেই। কয়েক দিন আগে রাষ্ট্রপুঞ্জের কনভেনশনে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা গেছে, ২০২০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর স্থলভাগের ৭৭ শতাংশ অংশে গত তিন দশকে আগের তিন দশকের তুলনায় জলভাগ ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে। এই কারণে পৃথিবীর মোট স্থলভাগ বেড়েছে ৪৩ লক্ষ বর্গকিলোমিটার।

চার্লসের রাজমুকুট

সেই মুকুট

রাজমুকুটের ভার কেমন? সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় চার্লস। মা রানি এলিজাবেথের মৃত্যুর পর চার্লসের মাথায় ইংল্যান্ডের রাজমুকুট। রাজা হওয়ার সময় তাঁর মাথায় পরানো হয়েছিল সেই সপ্তদশ শতকের রাজমুকুট, কোহিনুর বসানো। সদ্য এক তথ্যচিত্রে চার্লস বলেছেন, "যে বড় মুকুটটা দিয়ে অভিষেক হয়েছিল, রাজা এডওয়ার্ডের মুকুট, তার ওজন পাঁচ পাউন্ড (দু' কিলোগ্রামের বেশি)।" তিনি আরও জানিয়েছেন, "মুকুটটা বেশ ভারী এবং লম্বা। তাই ভয়ে ভয়ে ছিলাম। যদি টলমল করে ওঠে!"

জলদস্যু

ফের জলদস্যুরা এক জলযান অপহরণ করল। তাতে ছিলেন আঠারো জন মৎস্যজীবী। সোমালিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলে পুন্টল্যান্ডে সেই জলযানকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত আঠারো জন মৎস্যজীবী ভাল আছেন। তবে জলদস্যুরা পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চেয়েছে মুক্তিপণ বাবদ, ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় চল্লিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা।

জলদস্যু জাহাজের প্রতীকী ছবি

যা হবে

বিশ্ব ধ্যান দিবস

ধ্যানরত শিশু

বহু প্রাচীন অভ্যেস ধ্যান। ধ্যান করলে শরীর-মন ভাল থাকে। মনঃসংযোগ বাড়ে। ধ্যানের আরও অনেক উপকারিতা আছে। যেমন, নিয়মিত ধ্যান করলে মন খারাপ হয় না। তাই এখন ধ্যান করার জন্য ডাক্তার-মনোবিদরা বার বার বলছেন। কেমন করে এক জন ধ্যান করে? তার নানা পদ্ধতি। সঠিক প্রশিক্ষকের কাছ থেকে সেটা শেখা জরুরি। ধ্যানের গুরুত্ব বোঝাতেই ২১ ডিসেম্বর 'বিশ্ব ধ্যান দিবস' পালন করা হয়। ভারতে প্রাচীন কাল থেকেই ধ্যানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এই চর্চা করে এসেছেন এখানে। সেই চর্চা এখনও চলছে।

জাতীয় গণিত দিবস

শ্রীনিবাস রামানুজন

তাঁর মতো গণিতবিদ খুব কম এসেছে ভারতে। শুধু ভারতের কথা বলছি কেন, তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বেই। মাত্র বত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন শ্রীনিবাস রামানুজন। তাঁর আবিষ্কার করা 'রামানুজন প্রাইম', 'রামানুজন থিটা ফাংশন' নিয়ে এখনও চর্চা হয়। 'রামানুজন নম্বর' যা হল '১৭২৯' তো তাক লাগিয়ে দিয়েছিল গণিত বিশ্বে। তাঁর দেখানো পথ আজও অনুসরণ করে চলেছেন গণিতজ্ঞরা। ২২ ডিসেম্বর এই ক্ষণজন্মার জন্মদিন। সেই দিনই জাতীয় গণিত দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

বড়দিনের টুপি

বড়দিন

ডিসেম্বর মানেই ২৫ তারিখের অপেক্ষা। ডিসেম্বরের এই দিনে জিশুখ্রিস্টের জন্ম। সারা বিশ্বে খুব ধুমধাম করে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। আলোয় সেজে ওঠে রাস্তাঘাট। কেক ও নানা লোভনীয় খাবারে জমে ওঠে দোকানপাট। তবে ছোটদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু সান্তা ক্লজ। বাচ্চারা যখন ঘুমোয়, তিনি নাকি চুপি চুপি রেখে যান নানা উপহার। ওই সপ্তাহ শেষ হলেই নতুন বছর। তাই এক সপ্তাহ জুড়ে পিকনিকের মরসুম চলবে।

খুদে প্রতিভা

সামনেই আসছে জম্পেশ শীত। এমন শীতে লেপমুড়ি দিয়ে থাকার খুব আরাম। এক দিন ভোরে লেপের মধ্যে অবাক হয়ে দেখলে...কী? লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

প্রথম

উফ! আজ বড্ড শীত, চার দিক কুয়াশায় ঢাকা। রাতের পড়া শেষ করে লেপের মধ্যে ঝুপুস করে ঢুকে পড়ি। আহা! কী আরাম। চোখ দুটো কখন বুজেছে, জানা নেই। হঠাৎ কে চিৎকার করে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল। পাখিদের ডাকে বুঝতে পারলাম, এখন ভোর। দুটো জ্বলন্ত চোখ লেপের মধ্যে দেখতে পেলাম। আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। ক্রমশ চোখ দুটো এগিয়ে এল। তার পর লেপটা টানতে থাকল। বিষয়টি দেখার জন্য কৌতূহল হল। আকারে বিড়ালের মতো, কিন্তু কান নড়া দেখে বুঝতে পারলাম, এটা খরগোশ। হঠাৎ আমার মনে এল পিপিন খরগোশের কথা। ঠান্ডায় থর থর করে কাঁপছে। আমি যেই তাকে ধরতে যাব, নিমেষে ভ্যানিশ হয়ে গেল। মনে পড়ল রাস্তার কুকুরছানা, বিড়ালছানাদের কথা। আমরা দিব্যি লেপমুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমোই। কিন্তু তাদের লেপ কে দেয়? ঠান্ডায়, অসহায় তারা রাত কাটায়। সকাল হতেই মাকে সব কথা বলি। মা ওদের জন্য ছোট ছোট সোয়েটার তৈরি করে দেয়। আমি গিফ্‌ট হিসেবে তাদের দিয়ে আসি। প্রবল আনন্দে বাড়ি ফিরে আসি।

রবিউল সেখ
সপ্তম শ্রেণি, নওদাপানুর যুগল কিশোর উচ্চ বিদ্যালয়, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

তৃতীয়

শীতকাল মানেই পিঠে-পুলি খাওয়ার দিন। মেলা ও উৎসবের সময়। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। এ বার শুধু মাঠে ক্রিকেট খেলার সময়। পড়াশোনা নেই। তাই খুব সকালে ওঠার তাড়া নেই। লেপ জড়িয়ে অনেক ক্ষণ শুয়ে থাকা যায়। রং-তুলি নিয়ে মাঝে মাঝেই বসে পড়া যায়। এক দিন ছবি আঁকতে বসে গেছি। একটা অরণ্যের ছবি আঁকতে শুরু করেছি। কত রকমের গাছপালা, কত সব রঙিন ফুল আঁকতে আঁকতে রং ফুরিয়ে গেল। একটা গাছ রং করতে গিয়ে দেখলাম, সবুজ রং নেই। গাছটা খুব কষ্ট পেল। বলতে লাগল, "আমার পাতা এঁকে দাও। না হলে আমি বাঁচব না। আমরা না বাঁচলে তোমরাই বা বাঁচবে কী ভাবে?" বলেই কাঁপতে লাগল শীতে। ওর কেঁপে ওঠা দেখে আমিও কাঁপতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি, সকাল হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। আর আমার শরীর থেকে লেপটাও সরে গেছে। লেপমুড়ি দিতে গিয়ে দেখি, এক বাক্স রং পড়ে আছে। লেখা আছে 'সোনাইকে দিলাম এই উপহার—বাবা'। আমি আনন্দে এক লাফে উঠে পড়লাম। বাবাকে বললাম, "খুব প্রিয় এই রংগুলো। যত্নে রাখব।" বাবা হেসে বলল, "এই পৃথিবীটাই একটা রঙের বাক্স। সবচেয়ে আগে একে যত্নে রাখতে হবে আমাদের।"

শ্রুতায়ু পণ্ডা
ষষ্ঠ শ্রেণি, কৃষ্ণগঞ্জ কৃষি শিল্প বিদ্যালয়, হোগলা, পূর্ব মেদিনীপুর।

দ্বিতীয়

শীতের ভোরে রিমঝিম বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙল। ঘড়ির কাঁটা ছুঁয়েছে পাঁচটার ঘর। এই সব অনৈচ্ছিক বাধা ভুলে ঘুমোতে গিয়ে হঠাৎ লেপের মধ্যে অবাক হয়ে দেখলাম, ক্ষুদ্রকায় একটি মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। গায়ে রঙচঙে লাল-নীল জামা-প্যান্ট, হাতে লাঠি। বোঝা যায় যে, সে একটা সং। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?" সে মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "আমি জোজো। লিলিপুটিয়ান দেশ থেকে এসেছি।" আমি বুঝলাম যে, জোজো আমার বিশালাকৃতি দেহ দেখে ভীত। আমি বললাম, "ভয় পেয়ো না। আমি অনুপম। আজ থেকে আমরা বন্ধু।" আমরা অনেক গল্প করলাম। জোজো তার দেশের অচেনা-অজানা কতই না কথা বলল। তার কথাগুলো আমার কল্পনার জগতের কথা মনে হচ্ছিল। আমি জোজোকে আমার ছোট্ট বাগান ঘুরে দেখালাম। সে গাছগুলোর উপর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করল। আমি জোজোকে বললাম, "এখন ফিরে যাও। কেউ দেখে ফেলবে। আবার কিন্তু এসো। তোমাকে কোথায় পাব?" সে বলল, "তুমি এই লেপের মধ্যে আমাকে ডাক দিয়ো। আমি অবশ্যই আসব।" এর পর সে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনুপম বড়াল
সপ্তম শ্রেণি, বহরমপুর জেএন অ্যাকাডেমি, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

চতুর্থ

আমার রোজকার অভ্যেস মতো কালও আমি গল্পের বই নিয়ে ঘুমোতে গেলাম। বই পড়তে পড়তে কখন যে আমার চোখ বুজে গেল, আমি খেয়ালই করিনি। তবে আজ একটা বড় মজার কাণ্ড হয়েছে। আজ রবিবার, তার উপর যা জম্পেশ শীত, তাতে সকাল ন'টার আগে ঘুম থেকে ওঠার কোনও মানেই হয় না। সকালবেলা ঘুমচোখে লেপটা ওঠাতেই দেখি, একটা বড় বাক্স রাখা আছে ঠিক আমার মাথার উপরে। তা দেখে আমার ঘুম যে কোথায় উড়ে চলে গেল, সে কে জানে। বাক্স খুলেই দেখি একটা নীল রঙের নতুন গিটার। আমার আনন্দ আর দেখে কে! কিন্তু, না এখন আমার জন্মদিন আর না আমি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করেছি, তা হলে এটা দিল কে? ছুট্টে গিয়ে মায়ের কাছে যেতেই মা বলে উঠল, "আজ কত দিন পর তোর মৌদিদি এল, তোর জন্য গিফ্‌ট নিয়ে। তুই ঘুমোচ্ছিস দেখে তোকে ওঠাল না। কাজ ছিল বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।" ইস, আর একটু আগে উঠলে কী মজাই না হত!

নীল গিটার

অদ্রিজা রায়
সপ্তম শ্রেণি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল, কোন্নগর।

পঞ্চম

শীতে লেপমুড়ি দিয়ে থাকতে কার না ভাল লাগে। আমারও খুবই ভাল লাগে। এক দিন ভোরবেলা ঘুমোচ্ছিলাম, আর হঠাৎ মনে হল, হাতে-পায়ে কী যেন একটা লোমশ মতো ছুঁয়ে যাচ্ছে। আমি তো প্রথমে সহ্য করছিলাম, কিন্তু পরে বিরক্ত হয়ে উঠে, লেপ খুলে দেখি একটা সুন্দর লোমশ কুকুর আর সাদা বিড়ালছানা। ভাবলাম, আমার অনেক দিনের শখ,তাই বুঝি বাবা এনে দিয়েছেন। আদর করব বলে হাত বাড়িয়ে দেখি ও মা! বিড়াল, কুকুর তো কিছুই নেই। পাশে মা শুয়ে! তা হলে, এত ক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম!

কুকুরছানা

শারমিন আখতার
তৃতীয় শ্রেণি, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট, পদ্মপুকুর, বারুইপুর, কলকাতা।

আরও যারা ভাল লিখেছে

সমাদৃত দাস
অষ্টম শ্রেণি, গোরাবাজার ঈশ্বরচন্দ্র ইনস্টিটিউশন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

সেঁজুতি দত্ত
অষ্টম শ্রেণি, চাতরা নেতাজি বালিকা শিক্ষা নিকেতন, উত্তর ২৪ পরগনা।

সমগ্রা ঘোষ
তৃতীয় শ্রেণি, মাউন্ট লিটেরা জি স্কুল, মেদিনীপুর।

তানভী নাসরিন
সপ্তম শ্রেণি, অশোকনগর বাণীপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগনা।

অদিতি বিশ্বাস
পঞ্চম শ্রেণি, সবুজ অবুঝ শিশু অঙ্গন, হায়দারপুর, মালদহ।

বিদিতা চক্রবর্তী
পঞ্চম শ্রেণি, গার্ডেন হাই স্কুল, কলকাতা।

সমৃদ্ধি ঘোষ
পঞ্চম শ্রেণি, চিত্তরঞ্জন কলোনি হিন্দু বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস, বাগুইআটি, কলকাতা।

অদ্বিজা চিকি
চতুর্থ শ্রেণি, সেন্ট জন্‌স ডায়োসেশন গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কলকাতা।

অনুরাগ মৈত্র
ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া।

আনন্দী ঘোষ
ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা।

সৃঞ্জয় মৌলিক
চতুর্থ শ্রেণি, দোলনা ডে স্কুল, কলকাতা।

এ বারের প্রতিযোগিতা

স্পোর্টসে নাম দিতে তোমরা খুব ভালবাসো। এমন একটা মজার প্রতিযোগিতার নাম করো, যেটা কেউ কখনও শোনেনি। যারা ক্লাস টু থেকে এইটে পড়ো, আনন্দমেলার দফতরে লিখে পাঠাও ১০ জানুয়ারির মধ্যে। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম, ক্লাস, ঠিকানা, ফোন নম্বর জানিয়ো বাংলা ও ইংরেজিতে। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ২০ জানুয়ারি সংখ্যায় ছাপব। লেখার শব্দসংখ্যা দেড়শো। anandamelamagazine@gmail.com ইমেল আইডি-তে মেলবডিতে পেস্ট করে লেখা পাঠিয়ো।

ভূত আছে না নেই, তর্কটি প্রাচীন

পৃথিবীর প্রথম ভূত

প্রথম কবে হয়েছিল ভূতের উল্লেখ? কবে থেকে ভূতে ভয় পাচ্ছে মানুষ? পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের ভূতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের গল্প, লিখেছেন **অচ্যুত দাস**

সে দিন তর্ক হাতাহাতির পর্যায়ে গড়াচ্ছিল। তর্কটি পুরনো, কিন্তু তার ঝাঁঝ যুগে যুগে থেকে গেছে একই। তর্কের বিষয়: ভূত আছে না নেই? স্থান: আমাদের শহরের ধার ঘেঁষে বয়ে যাওয়া নদীর গায়ের বাঁধের উপর। টিউশনস্যর সে দিন এক ঘণ্টা আগেই ছুটি দিয়েছেন, তাই যে যার বাড়ি ফেরার আগে একটু আড্ডা মারব বলে প্রতীক, অর্কপ্রভ, আমি আর স্বাগতা বাঁধে এসেছিলাম, যেমনটা আমরা প্রায়ই আসতাম।

বাঁধের গায়ে ল্যাম্পপোস্ট অন্য জায়গার চেয়ে কম। বাঁধের উপর তাই আলো কম, আঁধার বেশি। উপরন্তু, বাঁধের উপর বছরের সব সময়ই পড়শি নদীর ঠান্ডা জলের প্ররোচনায় শিরশিরানি হাওয়া। ফলে এ কথা সে কথা হতে হতে সে দিন ভূতের আলোচনায় ঢুকে পড়তে আমাদের দেরি হয়নি। কে জানত, এই নিয়েই একেবারে তুমুল তর্ক বেঁধে যাবে প্রতীক আর স্বাগতার! এ বলে, "ভূত নেই, থাকতে পারে না, ছিল না কোনও দিন।" উত্তরে ও বলে, "তুই জাপান দেখিসনি মানে কি জাপান দেশটাই নেই নাকি?" বাড়ি ফেরার কারও তাড়া ছিল না, তাই আমি আর অর্ক কখনও প্রতীক, কখনও স্বাগতার পক্ষ নিয়ে তর্কের আগুন কিছুতেই নিভতে দিচ্ছিলাম না। এমন একটা মারমার কাটকাট সময়ে প্রতীক যেই না বলেছে, ভুতফুত হচ্ছে আধুনিক, অলস মানুষের কল্পনার ফসল, অমনি পাশ থেকে কে যেন বলে উঠেছিল, "আর আমি যদি বলি, সাড়ে তিন হাজার বছর পুরনো লেখায় মানুষ ভূতের কথা লিখেছে, তার ছবিও এঁকেছে!"

মিথ্যে বলব না, আমরা একটু চমকেই গেছিলাম। আবছা আলো-ছায়ায় অচেনা কণ্ঠস্বরটা কার? এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে চোখে পড়েছিল, আমাদের বেঞ্চের ঠিক পাশের বেঞ্চে রোগা-পাতলা এক জন লোক কে জানে কখন থেকে ঘাপটি মেরে বসে! প্রতীকের কথার জবাব এসেছে তার কাছ থেকেই। প্রতীক খুব বিরক্ত হয়ে জানতে চেয়েছিল, "কে আপনি? কী বলতে চান?"

ভদ্রলোক আশ্চর্য, উঠে পড়ে এগিয়ে এসে আমাদের বেঞ্চের এক পাশে একটু জড়সড় হয়ে বসে বলতে শুরু করেছিলেন, "আমি তো সন্ধের পর হাওয়া খেতে এ দিকটায় আসিই। কাছেই আমার

বাড়ি কিনা। তোমাদের তর্কাতর্কি অনেক ক্ষণই শুনছি। কিন্তু ওই যে তুমি বললে না, ভূত হল গিয়ে আধুনিক আর আসল মানুষের..."

আমি শুধরে দিতে বাধ্য হলাম, "আসল নয়, ভূতকে অলস মানুষের কল্পনা বলেছিল প্রতীক।"

ভদ্রলোক অদ্ভুত, হাওয়া খেতে এসেছেন, অথচ গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে। সেটা আরও ভাল করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে খুব এক গাল হেসে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আধুনিক আর অলস মানুষের কল্পনা। ঠিক! কিন্তু কথাটা তো ঠিক নয়। তাই আর থাকতে না পেরে..."

স্বাগতা নিজের দলে লোক পেয়ে উৎসাহ দিয়েছিল অচেনা লোকটিকে, "বেশ করেছেন। আপনি বলুন তো, সাড়ে তিন হাজার বছর আগের কথা কী যেন বলছিলেন!"

আমাদের ছোট শহরে প্রায় সকলেই সকলের মুখচেনা। মনে হল, এ লোকটিকেও আমরা দিনের আলোয় দেখলে কেউ না-কেউ চিনতে পারতাম। এখন পরিচয় জেনে কী বা হবে ভাবলাম, আর সে অবকাশও পাওয়া গেল না, কারণ ভদ্রলোক সটান বলতে শুরু করলেন, "ব্যাবিলনের নাম শুনেছ? মেসোপটেমিয়া সভ্যতা?"

অর্ক বলল, "সে আবার শুনব না? ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যানের কথা সেই কোন ছোটবেলা থেকে জানি!"

ভদ্রলোক হতোদ্যম না হয়ে আবছা মুখের উজ্জ্বল হাসি ধরে রেখে বললেন, "সেখানেই তো পাওয়া গেছে ভূতের প্রাচীনতম ছবি।"

প্রতীক ফস করে জ্বলে উঠল, "ভূতকে নাকি দেখাই যায় না। ব্যাবিলনের বাসিন্দারা কি ভূত দেখার উপায় বের করেছিল বলতে চান? মজা করছেন আমাদের সঙ্গে?"

ভদ্রলোক আমাদের চমকে দিয়ে বলতে থাকলেন, "মোটেই মজা করছি না। বেশি দিন না, বছর তিন চার আগে ব্রিটিশ মিউজিয়মের এক কোণে পড়ে থাকা একটা ক্লে ট্যাবলেট খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে জাদুঘরের এক কর্তা ভূতের ছবিটা দেখতে পান।"

ক্লে ট্যাবলেট কী জিনিস, তা-ও আমাদের অজানা নয়। ব্যাবিলনে আজ থেকে তিন, চার, পাঁচ হাজার বছর আগেও লেখালিখির চল ছিল। কিন্তু তখন তো এখনকার মতো দিস্তে দিস্তে কাগজ ছিল না। তাই মাটির তৈরি চ্যাপ্টা ফলকে লিখত সকলে। তাকেই আমরা নাম দিয়েছি, ক্লে ট্যাবলেট। মিশরের লোকেও ক্লে ট্যাবলেটে লিখত, জানি। প্রতীক তবু মানতে নারাজ। ভদ্রলোককে কথা শেষ করতে না দিয়েই সে বলল, "কী করে বোঝা গেল যে ওটা ভূতেরই ছবি? কেমন দেখতে সেই ভূতকে?"

ভদ্রলোক উৎসাহ পেয়ে বললেন, "ভূতের

শিল্পীর কল্পনায় ব্যাবিলনের সভ্যতা

ভূত মানুষকে উত্যক্ত করছে হাজার হাজার বছর ধরে

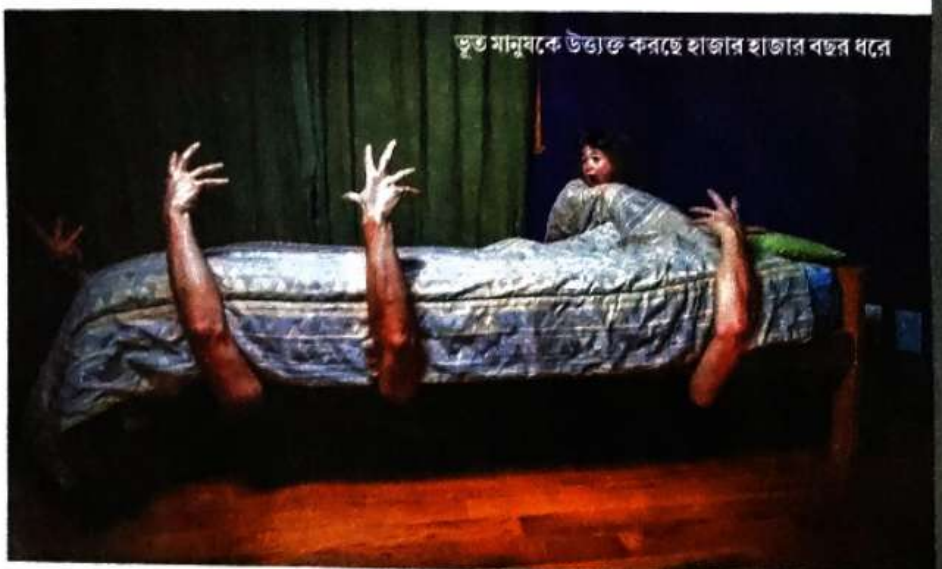

ভূতের প্রাচীনতম ছবি

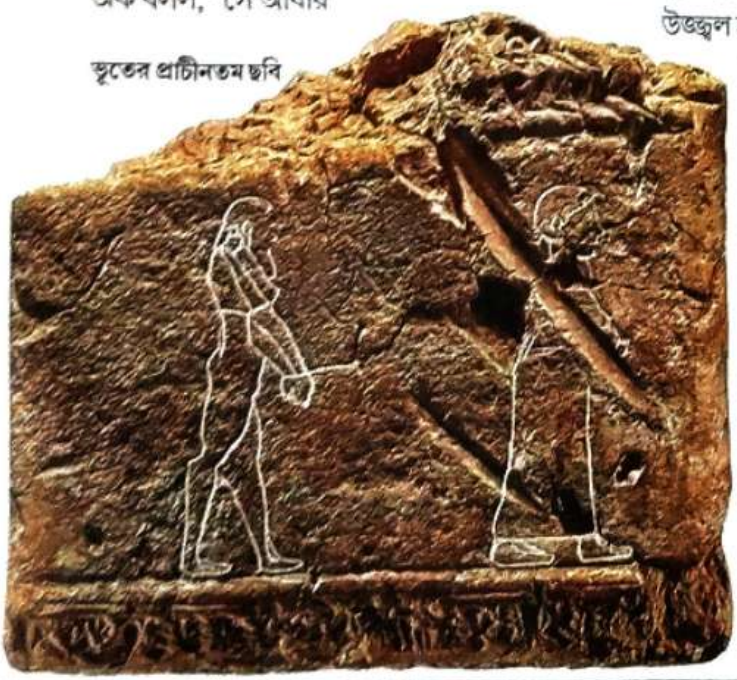

ভূত অকারণে আসে না, এই ছিল প্রাচীন বিশ্বাস

অনেকে মানতেন, অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে আত্মা ইহজগতে ফিরে আসতে পারে

ছবিটাও কিছু কম ভুতুড়ে ছিল না। খালি চোখে সে জিনিস ধরা পড়ে না। কিন্তু ক্লে ট্যাবলেটটার উপর আলো ফেলে, উপর থেকে তাকে দেখলেই ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠবে পরিষ্কার। ব্রিটিশ মিউজ়িয়মের সেই কর্তাব্যক্তি যখন ছবিটা খেয়াল করেন, তখন তিনিও বুঝতে পারেননি, ছবিটা কী বোঝাচ্ছে। কিন্তু ছবির উল্টো দিকে, ট্যাবলেটটার গায়েই প্রাচীন কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা ছিল ছবির বিবরণ। তোমরা যে... তোমাদের 'তুমি'ই বলছি... তোমরা যে হাতে হাতে ফোন নিয়ে ঘোরো, সেখানে ইন্টারনেটে সার্চ করলেই ছবিটা দেখতে পাবে। পেলে দেখবে, ছবির গায়ে রেখা বুলিয়ে ছবির চরিত্র দুটোকে স্পষ্ট করে দেখানোও হয়েছে কোথাও কোথাও। সেখানেই বোঝা যায়, ছবিতে আছেন দু'জন মানুষ। সামনে এক মহিলা হেঁটে যাচ্ছেন, পিছনে এক লম্বা দাড়ি-গোঁফের, শীর্ণকায় পুরুষ। বিষণ্ণ সেই পুরুষের দুটো হাতই দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেই দড়ির এক প্রান্ত ধরে লোকটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই মহিলা।"

ভদ্রলোক কথা শেষ করতে না-করতেই অর্ক জানতে চাইল সেই প্রশ্নটা, যেটা আমরা বোধ হয় সকলেই সেই মুহূর্তে মনে মনে ভাবছিলাম, "কী লেখা ছিল ট্যাবলেটের গায়ে কিউনিফর্ম লিপিতে? সেটা পড়া গেছে?"

অর্কর কৌতূহল দেখে ভদ্রলোক খুবই আনন্দ পেলেন যেন। নড়েচড়ে বসে বললেন, "যায়নি আবার! কিউনিফর্ম লিপি সেই সময় মধ্য প্রাচ্য ও তার আশপাশে অনেক দেশেই ব্যবহার হত। এই ট্যাবলেটের গায়ের লিপি পড়েই তো বোঝা গেছে, তার উল্টো পিঠের ছবিটা কী বোঝাচ্ছে। ট্যাবলেটের গায়ে লেখা আছে, মৃত আত্মীয়ের আত্মা কখনও তার বাড়িতে ফিরে এলে তাকে কী করে বিদেয় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির অতৃপ্ত আত্মা মৃত্যুর পরেও এক জন সঙ্গী খুঁজছিল। তাই ট্যাবলেটের গায়ে লিখে দেওয়া হয়েছে, এর থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে কী ভাবে দুটো ছেলে আর মেয়ে পুতুল জোগাড় করতে হবে। তাদের কী ভাবে সাজাতে হবে। ছেলে পুতুলটা এখানে মৃত আত্মীয়র আদল পাবে। ট্যাবলেটের গায়ের ছবিতে যেমন ছেলে পুতুলের মুখে ছিল বড় দাড়ি গোঁফ, পুতুলটা ছিল লম্বা। ট্যাবলেটে আরও লেখা ছিল, পুতুল দুটোর কোনটাকে কেমন পোশাক পরাতে হবে। তার পর ছেলেটার হাত দুটো কী ভাবে সামনে দিকে বেঁধে দিতে হবে। দড়ির বাঁধনের অন্য প্রান্তটা দিতে হবে মেয়েটার হাতে। মেয়েটা থাকবে সামনে। ছেলেটা পেছনে। সূর্যোদয়ের সময় সে দিকে মুখ করে ওই পুতুল দুটোকে রেখে সূর্যদেবতাকে স্মরণ করে মন্ত্র বলতে হবে। তা হলেই অশান্ত আত্মা কিংবা ভূত, তার নিজের জায়গা, প্রেতলোকে ফিরে যাবে।"

মেসোপটেমিয়ার ভূত

গা ছমছম করছিল, তাও আমাদের সকলের তীব্র একটা কৌতূহলও হচ্ছিল। আমরা তাই মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে ওঁর কথা শুনতে থাকলাম। মেসোপটেমিয়ার ভূত নিয়ে ভদ্রলোক আরও বললেন যে, সেখানকার লোকে বিশ্বাস করত, মৃত্যুর পর আত্মা যায় ইরকাল্লা নামের নরকে। মৃতদের স্যাঁতসেঁতে জগৎ, সেই ইরকাল্লার রানির নাম এরিশ্‌কিগল। তাঁর নজর এড়িয়ে ইরকাল্লা ছেড়ে বেরোনোর উপায় নেই কোনও আত্মার। এই সভ্যতার মানুষ ভাবত, কারও রোগ অসুখ হয়েছে মানেই সে নিশ্চয়ই কোনও ভীষণ বাজে কাজ করেছে। তাই তাকে ভগবান কিংবা ভূতে শাস্তি দিচ্ছে। মেসোপটেমিয়ায় দু'রকম ডাক্তার ছিলেন, আসু এবং আসিপু। আসু ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন লিখে ওষুধ দিতেন, দরকারে শল্যচিকিৎসাও করতেন। আর আসিপুরা মূলত টোটকা, তুকতাকে বিশ্বাসী ছিলেন। আসিপু ডাক্তাররা অসুস্থ মানুষের ভূত তাড়াতে মন্ত্রও পড়তেন,

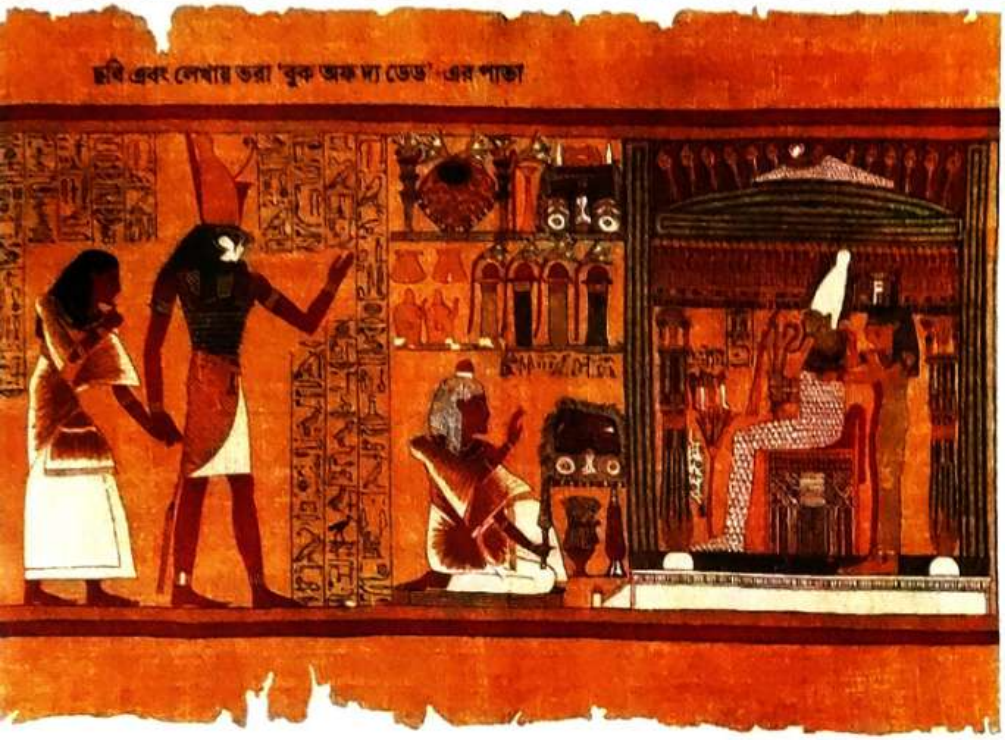

ছবি এবং লেখায় ভরা 'বুক অফ দ্য ডেড'-এর পাতা

কিন্তু তার আগে তাঁরা ভূতের উপদ্রবে অতিষ্ঠ মানুষটিকে বলতেন, নিজের জীবনের সমস্ত কুকর্মের কথা স্বীকার করতে। এক মাত্র তবেই অশান্ত আত্মা নিজের জগতে ফিরে যাবে। মেসোপটেমিয়ার লোকেরা ভূতকে বলত গিডিম। মৃতের শ্রাদ্ধশান্তি ঠিক মতো না হলে, কিংবা মৃত্যু অস্বাভাবিক ভাবে হলেও গিডিম প্রেতলোক ছেড়ে ইহলোকে ফিরে আসত। আবার কখনও সম্পূর্ণ অকারণেও ফিরে এসে সাধারণ মানুষকে উত্ত্যক্ত করত। এই পাজি ভূতদের শাস্তি দিতেন সূর্যদেবতা শামাশ। পাজি ভূতের খাবার চুরি করে তিনি সেই দুঃখী ভূতদের দিতেন, পৃথিবীতে যাদের কোনও আত্মীয়ই বেঁচে নেই। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে গিডিম কখনও ইহলোকে ফিরেছে, এমন ঘটনার বর্ণনাও লেখায় পাওয়া গেছে মেসোপটেমিয়া থেকে।

তিন মাথাওয়ালা কুকুর, সেরবেরাস

মিশরের ভূত

একটা দিন অবসর পেয়ে ভূতের ভূতকালের গল্প শুনতে ভালই লাগছিল। মিশরের সভ্যতা অন্তত পাঁচ হাজার বছর পুরনো বলে জানি। মৃত্যুর পরে আত্মার কী হয়, পরলোক কেমন, এই নিয়ে তাদের চূড়ান্ত কৌতূহল এবং কিছু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ-ও আমরা সকলে জানি। পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের রীতিনীতি লেখা ওদের বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে, 'দ্য বুক অফ দ্য ডেড'। সে দিন আরও জানলাম, 'মৃত্যুর পর আমি আর থাকব না,' এটা ভাবতে মিশরীয়রা খুবই ভয় পেত। ওদের বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুর পর আত্মা সত্যের সভাঘরে যায়। সেখানে দেবতা ওসাইরিস এবং বিয়াল্লিশ জন বিচারকের সামনে তার বিচার হয়। একটা দাঁড়িপাল্লার এক দিকে মৃত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড চাপানো হয়। অন্য দিকে থাকে সত্যের সাদা পালক। সেই পালকের তুলনায় কারও হৃদয় হালকা হলে তার আত্মা সিধে স্বর্গের বাগানে চলে যায়, আবার পরজন্মের সুযোগ পায়। কিন্তু উল্টোটা হলে হৃৎপিণ্ডটা ছুড়ে ফেলা হয় মাটিতে আর সঙ্গে সঙ্গে আমিট নামের দৈত্য তেড়ে আসে। আমিটের মাথাটুকু কুমিরের। কেশর আর গা-টা সিংহের। কোমর থেকে বাকিটা জলহস্তীর। সত্যের সভাঘরে ছুড়ে ফেলা হৃদয় কামড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে আমিট। দুষ্ট আত্মার গল্প

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সায়নদেব মুখোপাধ্যায় কিশোরদের জন্য লিখলেন সায়েন্স ফিকশনের মোড়কে দেশ-বিদেশে অভিযানের গল্প

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের হুকাকাশি, শিব্রামের কলকে-কাশির পর বাংলা সাহিত্যে তৃতীয় কাশি প্রফেসর টাকাশি কেশোরুগি

ডক্টর টাকাশি কেশোরুগির

সায়েন্স ফিকশন অ্যাডভেঞ্চার

ফাঁপা কার্তুজ ৫০০৲

১৯৬৫ — আন্দামান এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার সুদান, ইথিয়োপিয়া, জিবুতি, সোমালিল্যান্ড ও এরিট্রিয়া। প্যালেয়োন্টোলজি বা ফসিল বিজ্ঞান এবং ইভোলিউশন বিজ্ঞানের সঙ্গে উগ্র মৌলবাদে বিশ্বাসী ধর্মান্ধদের সংঘাত।

প্রবালের হাড় ৫০০৲

১৯৬৭ — বোম্বে এবং ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল। অ্যান্টিসাবমেরিন ওয়ারফেয়ার, সামুদ্রিক প্রাণী ও সমুদ্রতত্ত্ব।

উকুনের নাচ ৫০০৲

১৯৬৯ — সুদান ও সংলগ্ন 'সাহেল' মরুভূমি। এককোশী থেকে বহুকোশী প্রাণীদের সৃষ্টি, কীটতত্ত্ব, এবং 'সুপার অর্গানিজম'-এর বিশেষত্ব।

কর্কট হাউই ৫০০৲

১৯৭০ - বোম্বে ও কেরালা রকেট টেকনোলজির বিবর্তন ও ধ্বংসকারী মিসাইলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রধাসকল।

ডক্টর টাকাশি কেশোরুগির নেতৃত্বে কয়েকজন অধ্যাপক গবেষক ছাত্র বছরের পর বছর বিশ্ব জুড়ে অন্বেষণ করে চলেছেন সত্যের, বিজ্ঞানের।

এই সিরিজের প্রথম বই শকের তূণ উপহার হিসেবে দেওয়া হবে কেশোরুগির পাঠকদের

অ অভিযান পাবলিশার্স

বিক্রয়কেন্দ্র

অভিযান বুক ক্যাফে

১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট

কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ৭৩

কল/হোয়াটস্যাপ ৮০১৭০৯০৬৫৫

সেখানেই শেষ। মৃত্যুর পর দেবতাদের সামনে এই পরীক্ষায় পাশ করতে না পেরে পরলোক গমন ভেস্তে না যায়, সেই ভয়ে মিশরীয়দের সংযত জীবন যাপন করতে বলা হত।

প্রথম দিকে মিশরে আত্মাকে বলা হত 'খু'। পরের দিকে ওরা মানত, সব আত্মারই ৯টি উপাদান আছে। তার দু'টি, 'বা' আর 'কা' মিলে তৈরি হয় 'আখ'। এই আখই কারণে বা অকারণে ইহজগতে ফিরে এসে গোলমাল বাধায়। মিশরের এক মহিলার প্রাচীন সমাধিতে তার স্বামীর চিঠি পাওয়া গেছে। তাতে বার বার লেখা, 'আমি তো তোমার সব কথা মেনে চলি। তোমার কথাই ভাবি। তোমার শেষকৃত্যে কোনও ত্রুটি রাখিনি। তাও কেন তুমি আমাকে শান্তিতে একা থাকতে দিচ্ছ না?' ভূত ফিরে এসে উৎপাত করে, এ কথা সুতরাং, মিশরীয়দের অনেকেই সত্যি বলে মনে করত। ভূতের উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে পুরোহিতদের ডেকেও আনত।

গ্রিস ও রোমের ভূত

মধ্য প্রাচ্যের ভূতেদের গল্প শুনে এ বার ইচ্ছে করছিল ইউরোপের ভূতুড়ে অতীত জানতে। নিরাশ হতে হল না, কারণ দেখা গেল ভদ্রলোক এ সবই গুলে খেয়েছেন। গড়গড় করে তিনি বলে গেলেন, প্রাচীন গ্রিসের লোকের বিশ্বাস ছিল, পরলোকে তিন-তিনটে আলাদা জগৎ। সেই জগৎ পর্যন্ত পৌঁছোনোর গল্পটিও চমৎকার। কেউ মারা গেলে গ্রিকরা তাঁর মৃতদেহের মুখের উপর একটি কয়েন বা মুদ্রা রাখতেন। প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, মৃত আত্মাকে পরলোকে নিয়ে যাবে একটি নৌকা। সেই নৌকার মাঝির পারিশ্রমিক ওই কয়েন। মনে করা হত, যত দামি কয়েন, নৌকায় বিদেহী আত্মা তত ভাল জায়গা পাবে। নৌকা চেপে পরলোকে পৌঁছে গেলে আত্মার দেখা হবে তিন মাথা ওয়ালা কুকুর, সেরবেরাসের সঙ্গে। হ্যারি পটারের গল্পে হ্যাগ্রিডের পোষ্য, তিন মাথা ওয়ালা কুকুর ফ্লাফির অনুপ্রেরণাও এই সেরবেরাসই। গ্রিকদের বিশ্বাস ছিল, সেরবেরাসের সাক্ষাৎ পাওয়ার পরেই তিন বিচারকের

সত্যের সভাঘরে আনুবিসের সামনে দাঁড়িপাল্লায় হৃদয়ের ওজন নেওয়া হচ্ছে, মাটিতে দাঁড়িয়ে আমিত

মায়া সভ্যতার ভূতুড়ে নিদর্শন

সামনে দাঁড়িয়ে আত্মাকে তাঁর জীবদ্দশার কর্মকাণ্ডের হিসেব দিতে হবে। সেটি হয়ে গেলে বিচারকত্রয়ী আত্মাকে স্বর্গের নদী থেকে এক পেয়ালা জল পান করতে দেবেন। সেই জল খেলেই আত্মা তার ইহকালের সমস্ত ঘটনা ভুলে নতুন জীবনের জন্য তৈরি হবে।

তার পর জানলাম, সেই তিনটে জগতের কথা। কোনও যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলে তাকে পাঠানো হত 'এলিসিয়ান ফিল্ড'-এ, যা আমাদের স্বর্গের মতো। কেউ ভাল মানুষের জীবন কাটালে তাকে পাঠানো হত 'অ্যাসফোডেল'-এর সমতলে, যেটিও মোটামুটি মনোরম জায়গা। মন্দ লোকের আত্মাকে যেতে হত 'টারটারাস' নামের অন্ধকার জগতে। কিন্তু কোনও আত্মাকেই সেখানে চির কাল থেকে যেতে হত না। টারটারাসের আত্মার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হলে সে অ্যাসফোডেল বা এলিসিয়ান ফিল্ডে ফিরে আসত। অর্থাৎ, অনন্ত কাল নরকভোগের ধারণা বা বিশ্বাস গ্রিকদের মধ্যে ছিল না।

আরও জানলাম, রোমের মানুষদের মধ্যেও ভূত নিয়ে চর্চা চলত। অনেক বিখ্যাত রোমান নাটক কিংবা গল্পে বার বার ভূতদের প্রসঙ্গ এসেছে। কোনও নাটকে হয়তো ভূত ছিলই না, নাটকের চরিত্ররা নেহাতই মজার ছলে একে অন্যকে ভূতের কথা বলে ভয় দেখাচ্ছিল। কোনও গল্পে আবার দেখানো হয়েছে, ভূত ইহজগতে ফিরে এসে জীবিতদের সঙ্গে তোফা সময় কাটাচ্ছে। সেখানেই শেষ নয়, আরও শুনলাম— জিশুখ্রিস্টের জন্মের একশো বছর মতো পরে, রোমান লেখক

প্লিনি দ্য ইয়ঙ্গার একটা গল্প লিখেছেন। তাতে অ্যাথেনোডোরাস নামের এক দার্শনিক এথেন্স শহরে এসে ভাড়াবাড়ি খুঁজতে গিয়ে এক ভূতুড়ে বাড়ির সন্ধান পান। ভূতের উপদ্রবের জন্য সেই বাড়ির ভাড়া কম, তাই অ্যাথেনোডোরাস সেখানেই থাকা মনস্থ করেন। রাতের বেলা শিকলের ঝনঝনানি শুনে ঘুম ভাঙলে তিনি দেখেন, শীর্ণকায়, বয়স্ক, দাড়িওয়ালা এক ছায়ামূর্তি তাঁকে ঘরের বাইরে যেতে ইশারা করছে। তার পিছু হেঁটে অ্যাথেনোডোরাস বাড়ির উঠোনে আসতেই ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে যায়। ঠিক যেখানে সে অদৃশ্য হয়েছিল, অ্যাথেনোডোরাস পর দিন সকাল সকাল লোকজন ডেকে সেখানকার মাটি খোঁড়াতে শুরু করেন। কিছুটা খুঁড়তেই শিকলে বাঁধা একটা কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যায়। সেই দেহাবশেষকে যথাবিধি রীতি মেনে আবার সমাধিস্থ করার পর সেই বাড়িতে ভূতের উপদ্রব বন্ধ হয়।

এই গল্পে ঠিক মতো সমাধিস্থ করা হয়নি বলে ভূত ফিরে এসেছিল। অন্য এমন অনেক কাহিনিও রোমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যেখানে অতৃপ্ত আত্মা অন্যায় ভাবে হওয়া তাঁর অসময়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ফিরে আসত। এ সব থেকেই বোঝা যায় যে, ভূত, পরলোক এবং ভূতের আবার ফিরে আসা— এই নিয়ে রোমানরা ভালই চর্চা করত, গল্প-নাটক লিখত, ভয়ও পেত।

অসময়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারে ভূত, মানত রোমানরা

'চুড়েল' ছিল আমেরিকাতেও

চিন দেশের ভূত

অনেক ক্ষণ গল্প শুনেও বিরক্ত লাগছিল না, বরং আরও জানতে ইচ্ছে করছিল। ভদ্রলোকও মনে হচ্ছিল, আমাদের মতো মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে খুব খুশি। বিলেত ছেড়ে তিনি এ বার সটান চলে এলেন আমাদের পড়শি দেশ, চিনে। বললেন, খ্রিস্টজন্মের পাঁচশো বছর আগে, মানে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেও চিনা দার্শনিক মো তি ভূতে বিশ্বাসের কথা লিখে গিয়েছেন। সেই সময় চিনে রটে গেছিল, এক মন্ত্রীর ভূত ইহলোকে ফিরে এসে তখনকার এক রাজাকে হত্যা করেছে। মো তি এই রটনা বিশ্বাস করেছিলেন। কারণ, যাঁরা এই ঘটনার কথা তাঁকে জানিয়েছিলেন, তাঁদের উপর মো তি-র বিশ্বাস ছিল অগাধ। বিশ্বস্ত লোকের বলা ভূতের গল্পও বিশ্বাস করব, এই ছিল মো তি-র মতামত।

এমনিতে চিনের আদি বাসিন্দাদের পরলোক সম্পর্কে ধারণা মিলে যায় গ্রিকদের প্রাচীন বিশ্বাসের সঙ্গে। ওদের মতো চিনারাও মানত, মৃত্যুর পর আত্মা তার পুরনো জীবনের কথা সব ভুলে গিয়ে হয় স্বর্গসুখ ভোগ করে কিংবা নরকে গিয়ে অশেষ দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়। ওরা এ-ও মানত যে, পরলোক থেকে আত্মা এমনি এমনি ফিরে আসে না। এলে, সুনির্দিষ্ট কারণে আসে এবং কিছু একটা গোলমাল পাকাতেই আসে। তেমন গোলমাল বাধে না, যদি কারও অস্বাভাবিক মৃত্যু না হয়, যদি মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। চিনের প্রাচীন ভূতের গল্পগুলোয় তাই অনেক সময়ই উপদেশ আকারে এই কথাগুলো লেখা থাকত।

পশ্চিমের ভূত

আমেরিকার মায়া আর অ্যাজটেক সভ্যতার কথাও আলোচনায় এল। মেসোপটেমিয়ার লোকেদের মতোই মায়া সভ্যতার লোকেরাও বিশ্বাস করত, পরলোক খুবই বিচ্ছিরি আর অন্ধকার এক

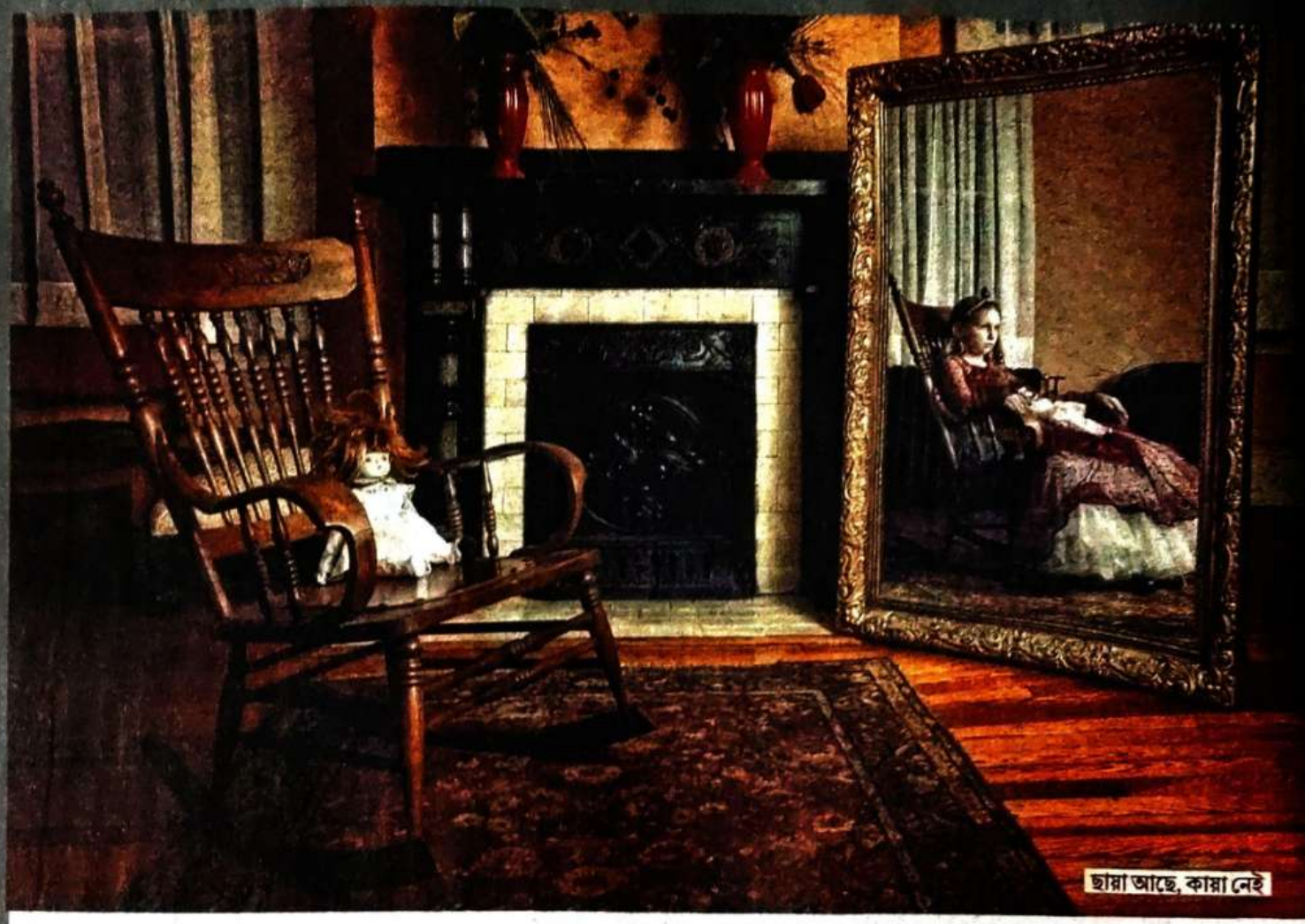

ছায়া আছে, কায়া নেই

জায়গা। ভদ্রলোক বলছিলেন, "আমাদের নরক ছিল ওদের 'জ়িব্যালবা'। সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খুঁজত আত্মারা আর সেটা আটকাতে নানা রকম ফন্দি করত জ়িব্যালবার একাধিক 'লর্ড অফ দ্য ডেড'। সমস্ত বাধা পেরিয়ে আত্মাকে পৌঁছোতে হত জীবনবৃক্ষের (ট্রি অফ লাইফ) কাছে, যা বেয়ে উপরে উঠে গেলেই সিধে পৌঁছে যাওয়া যেত স্বর্গে। এই ছিল মায়াদের বিশ্বাস।"

শুনে অবাক হয়ে গেলাম, ভারতের উত্তর ও পশ্চিম দিকের হিন্দিভাষীরা যাকে বলেন 'চুড়েল', কিছুটা সেই একই জিনিসে বিশ্বাস ছিল সেই কোন সুদূর আমেরিকার অ্যাজ়টেক সভ্যতার মানুষদের। ওদের চুড়েলের নাম ছিল সিহুয়াটেটেও। সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছেন এমন মহিলার ভূতই হল সিহুয়াটেটেও। অ্যাজ়টেকরা বিশ্বাস করত, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পথচারীদের অপেক্ষায় থাকত এই ভূত। পুরুষদের সে কিছু বলত না। কিন্তু কোনও মহিলা তার সন্তান নিয়ে রাস্তায় বেরোলে মহিলাকে মেরে তার বাচ্চা চুরি করে পালাত সিহুয়াটেটেও। ভদ্রলোক বললেন, "ওদের প্রচলিত বিশ্বাসে ভূত ছিল, ফলে ভূতের জ্বালাতন থেকে বাঁচার উপায়ও চাই। ভূতকে ঠেকানোর জন্য এখন যেমন চলে, তেমন তাবিজ, কবচ, ফুল, মালার টোটকা সে আমলেও চলত।"

ভারতের ভূত

"সবই বুঝলাম। কিন্তু আসল প্রশ্নটার উত্তর তো এখনও পাওয়া গেল না। ভূত আছে না নেই?" স্বাগতা বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ে হাত-পা টানটান করতে-করতে বলল। আমি ফোড়ন কাটলাম, "আর ভারতের কথাও তো আলাদা করে কিছু বললেন না। ভারতে কি ভূত ছিল না নাকি?"

ভূতের উপদ্রবে মানুষের বিশ্বাস অনেক প্রাচীন

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "পরের প্রশ্নটার উত্তর আগে দিই। ভারতীয় পুরাণের কাহিনিতে দৈত্য, দানো, ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনীদের উল্লেখ আছে, সে তো তোমরা জানোই। এমনকি অনেক ঐতিহাসিক বলেন, মৃতকে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা, যাতে কোনও ভাবেই মৃতের আত্মা তার দেহে ফিরে আসতে না পারে— ভারতীয়রা এই ভাবনা থেকেই মৃতদেহ সমাধিস্থ না করে বরং পুড়িয়ে ফেলার রীতি শুরু করেছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভূত নিয়ে কিছু কিছু বিশ্বাস একই রকম। যেমন ধরো, অশরীরী কোনও রকমে দেহ ধারণ করলেও তার ছায়া মাটিতে পড়ছে না। কিংবা সে হেঁটে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ তার পায়ের পাতা ঘুরে আছে পিছন

দিকে। বা ধরো, পেতনির হাত-পা লম্বা হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনের গাছ থেকে ফুল, ফল পেড়ে আনছে— এমন নানান গল্প তোমরাও ছোটবেলায় শুনেছ নিশ্চয়ই।"

অনেক দিন আগে পড়া অনেক ভূতের গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। ভদ্রলোকের মুখে নতুন নতুন গল্প শুনেও ভালই লেগেছে, কিন্তু মুখে সেটা স্বীকার না করে প্রতীক গোমড়া মুখে জানতে চাইল, "বুঝলাম, হাজার হাজার বছর আগে থেকেই লোকে ভূতে ভয় পাচ্ছে। এখন ভেবে দেখছি, সেটাই স্বাভাবিক। অনেক আগেকার মানুষের আয়ু ছিল কম। রোগ-অসুখে জর্জরিত ছিল জীবন। ওষুধবিষুধ এখনকার মতো জানত না। ইলেকট্রিসিটি ছিল না। রাত নামলে আগুনের শিখাই ছিল আলোর এক মাত্র উৎস। ফলে রোগে ভুগলে, দুর্যোগে পড়লে এই সব আজগুবি জিনিসে বিশ্বাস না করে তারা আর যাবে কোথায়? আপনি বলুন, ভূত আছে না নেই?"

তত ক্ষণে রাত অনেকটাই হয়েছে। বাড়ি ফিরতে আরও দেরি করলে প্রত্যেকেই বাড়িতে বকুনি খাব। আমরা তাই এক-এক করে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে হাত-পা ঝাড়ছিলাম। ভদ্রলোকও উঠে পড়লেন। গালার মাফলারটা আরও এক বার ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, "ভূত সত্যি আছে কি না জানতে চাও? তার জন্য সাহস করে দু'পা হেঁটে আমার সঙ্গে আমার বাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে। বলো, যাবে?"

আমরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছি, ও মা, ভদ্রলোক আমাদের

ভূত থাকলে, সে হতেই পারে প্রতিহিংসাপরায়ণ

ভূত-পিশাচে বিশ্বাস ছিল উন্নত সভ্যতাদেরও

ভূতের গল্পও পৃথিবীর অনেক জায়গায় একই রকম

উত্তরের অপেক্ষা না-করে উল্টো মুখে হাঁটা দিলেন! চোখে চোখে ইশারায় কথা বলে আমি, অর্ক আর স্বাগতা ঠিক করলাম, ভদ্রলোকের কথা শুনে যতই ভাল লাগুক, এত অল্প পরিচয়ে ওঁর বাড়ি আমরা যাব না। কিন্তু প্রতীক নাছোড়বান্দা। আমাদের চোখরাঙানিকে পাত্তা না দিয়ে সে ভদ্রলোকের পিছু নিল আর এক-দু'পা এগোতেই মুখে একটা বিকট বুঁ বুঁ আওয়াজ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অদ্ভুত শব্দটা শুনে আমরা প্রতীককে টপকে ভদ্রলোকের প্রস্থানোদ্যত চেহারাটার দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলাম কী হয়েছে।

পিছু নেওয়ার সাহস হয়নি। চার জনই সে দিন স্পষ্ট দেখেছিলাম, ইতিমধ্যে গলার মাফলার খুলে ফেলে ভদ্রলোক হেঁটে যাচ্ছেন আমাদের থেকে দূরে। তাঁর ধড় আর মুন্ডু যে যার জায়গায় থাকলেও গলার কাছটায় কিছু নেই। ধড়ের উপর মাথাটা যেন হাওয়ায় ভেসে আছে। ভয়ে শিউরে উঠে মাটির দিকে চোখ নামাতেই দেখতে পেয়েছিলাম, উনি সামনে এগিয়ে গেলেও ওঁর পায়ের পাতা দুটো আমাদের দিকেই ঘোরানো!

ছবি: আইস্টক, ইন্টারনেট, এক্স

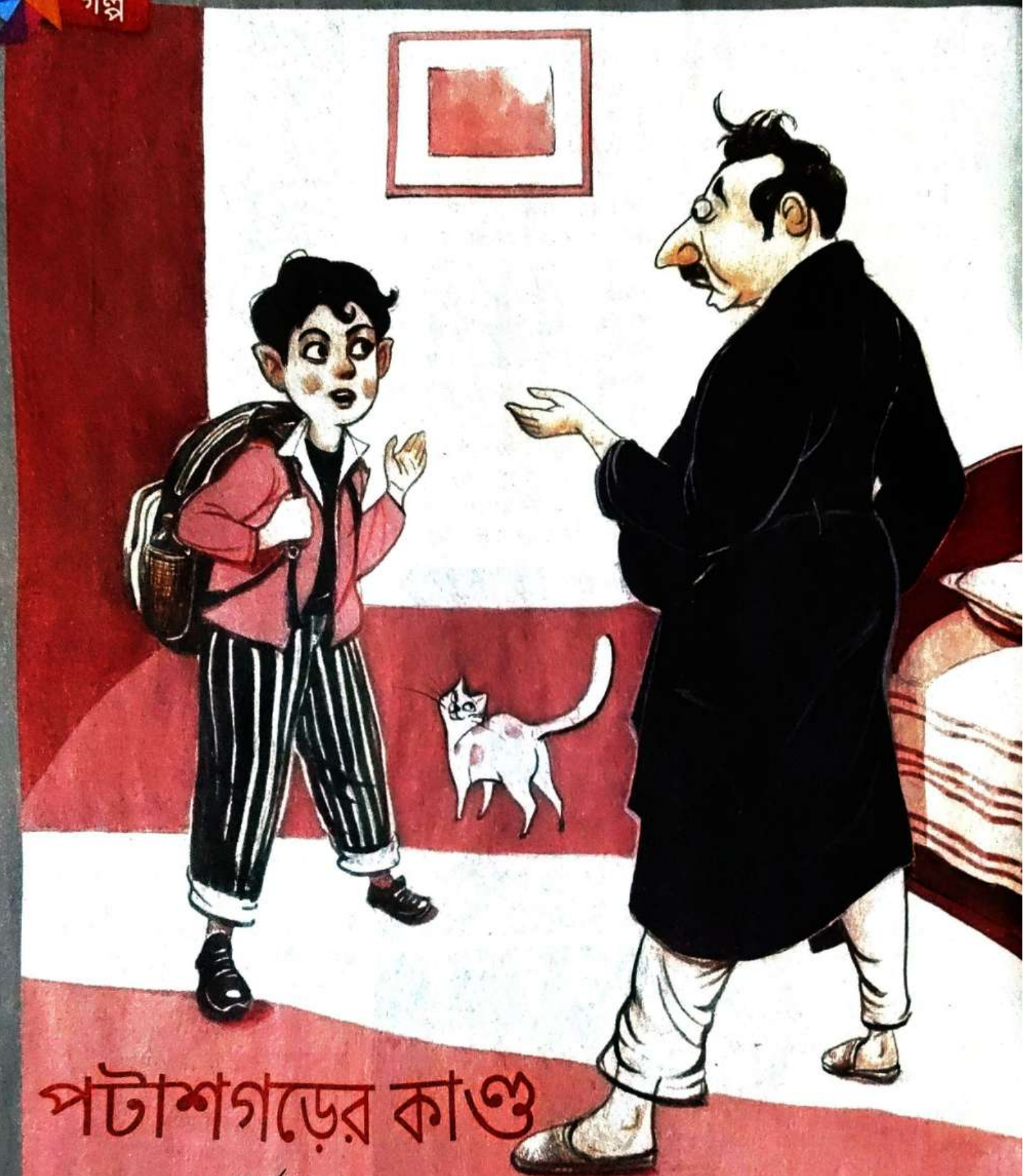

পটাশগড়ের কাণ্ড

স্বর্ণেন্দু সাহা

পটাশগড়ে শেষ কবে কোনও রকম অপরাধ হয়েছে, তা কেবল দু'-এক জন মানুষই মনে করতে পারে। সে সব কাহিনি স্মরণ করা হয় রূপকথার মতো। এখানে গ্রামবাসীর দিন কাটছে বেশ সুখেই। দরজা খোলা রেখে ঘুমোলেও চুরির বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই। রাতবিরেতে রাস্তায় একলা বেরোলে ছিনতাইয়ের ভয় নেই। দু'জন মানুষের মতবিরোধ বা মন কষাকষি এমন জায়গায় পৌঁছোয় না

যে, মারপিট করে তার সমাধানের দরকার হয়।

এই শান্ত, নিরুপদ্রব গঞ্জেও আচমকা হাজির হল এক অদ্ভুত চোর। এ রকম চোরের খপ্পরে আগে কোনও দিন পড়েনি পটাশগড়।

মন্দিরের পুরোহিতের বসার আসন চুরি হয়ে গেল তিনি বসে থাকা অবস্থায়। মন্ত্রপাঠ করার সময় মোটা কাপড়ের আসনটার উপর বসেছিলেন তরিবৎ করে। উঠতে গিয়ে দেখেন, লাল সিমেন্টের মেঝের উপর
উঠে দাঁড়াচ্ছেন।

অম্বরীশ সান্যাল বাজার করতে-করতে একটু ক্লান্ত হয়ে গেছিলেন। হাত ব্যথা করছিল অল্প। তাই ছয় সেকেন্ডের জন্য ব্যাগ নামিয়ে রেখেছিলেন রাস্তায়। তার মধ্যেই ব্যাগ বেমালুম উধাও।

স্কুল থেকে ফিরে শ্যামল ক্রিকেট বল নিয়ে লোফালুফি খেলছিল। আকাশের দিকে ছুড়ে দেয় আর লোফে। এক বার ছুড়ে দিল। কিন্তু সেই বল আর হাতে এল না। মাঝ আকাশ থেকেই অদৃশ্য।

অণিমা বঁটিতে মাছ কুটছিলেন। মুড়োটা আলাদা করেছেন। ধড় কাটতে মাছটা এগিয়ে নিয়ে গেলেন বটির ফলার দিকে। মাছ স্রেফ হাওয়া কাটল। আস্ত বঁটি নিখোঁজ।

এ রকম সব কাণ্ড একের পর-এক ঘটতে থাকল। চুরি সাধারণত রাতে হয়, এমনটাই ভদ্রতা। কিন্তু এ ব্যাটা ভদ্রতার ধার ধারলে তো! রাতের বেলা একখানাও চুরি হয়নি। সতর্ক থাকার হাজার চেষ্টা করে কোনও লাভ হচ্ছে না। এর মধ্যেও আনন্দের ব্যাপার, এ চোর নেহাতই ছিঁচকে। দামি গয়না বা টাকা-পয়সা চুরির দিকে এর নজর নেই একদম। নজর নেই কী, বোধ হয় বরং ঘেন্নাই আছে। নরহরির মানিব্যাগ চুরি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা থেকে বের করে রেখে দিয়ে গেছে এক-একটি পাই পয়সা।

গ্রামসুদ্ধ লোক ভারী বিজ্ঞান-সচেতন। ভূত-প্রেত বা অলৌকিকে কেউ সামান্যও বিশ্বাস করে না। তাই এ ক্ষেত্রেও অতিলৌকিক কিছু ঘটার সম্ভাবনা তারা ভেবেই দেখল না। অথচ চুরি যে হচ্ছে, সে ব্যাপারে প্রায় সকলেই নিশ্চিত। কিন্তু কৌশল বুঝতে পারছে না। এখন তা হলে কী করণীয়? বিপদ থেকে মুক্তির উপায় তো বের করতে হবে। অর্থাৎ চোরকে পাকড়াও করার প্রয়োজন অবিলম্বে। সে কাজের দায়িত্ব কে নেবে? গ্রামে একটা থানা আছে বটে, সেটা মনে পড়ল কয়েক জনের। নিজেদের মধ্যে কিছু শলা-পরামর্শ করে চার জন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ রওনা দিল সে দিকে।

গাঁয়ের মাতব্বররা যখন থানার চৌহদ্দিতে এসে পৌঁছোল, তখন দুপুর। থানায় ঢুকে দেখল, সকলে ঘুমোচ্ছে। ভারী শান্ত আবহাওয়া। আবহসঙ্গীত হিসেবে যোগ্য সঙ্গত করছে কোরাসে নাক ডাকার আওয়াজ। অনেক দিন ধরে এই পুলিশদের মুখ আর উর্দি চোখেই পড়েনি কোনও গ্রামবাসীর। তারা একটু কৌতূহলের চোখেই দেখতে থাকল।

দারোগা টেবিলের উপর হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছেন। তিন জন কনস্টেবলের কেউ পেতে রাখা বেঞ্চে লম্বা করে, কেউ বা চেয়ারে শরীর এলিয়ে ঘুমে ডুবে আছে। কনস্টেবল ও দারোগা, সকলের ভুঁড়ির আকার ঈর্ষণীয়। এক-এক জনের চেহারা উল্লেখযোগ্য রকমের পেল্লায়। দেখলেই সমীহের চোটে মনটা খানিক নুইয়ে আসে।

দারোগার ঘুম ভাঙাতে সাহস পেল না কেউ। বেঞ্চে গড়ানো এক হাবিলদারকে ডাকল। অসময়ে নিদ্রাজগৎ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হওয়ায় কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেও কনস্টেবল তা প্রকাশ করল না। বরং বহু দিন পর একঘেয়ে জীবনে কিছু ঘটার সম্ভাবনা জন্মেছে, এই ভেবে উৎফুল্ল হল। এক ঝলক তাকিয়ে নিল শূন্য গরাদের দিকে। জেলটা ফাঁকা পড়ে আছে সেই কবে থেকে! এ বার কি শূন্যস্থান পূরণের কোনও ব্যবস্থা হতে চলেছে!

সে দারোগাকে ডাকল বার কয়েক। কোনও সাড়া নেই। কাঁধ ধরে নাড়া দিল। প্রতিক্রিয়া নেই। তবে নাসিকা-গর্জন থামল। এর পর কানের সামনে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে চেঁচাল সে, সঙ্গে বেশ জোরে ধাক্কাও দিল।

ঘুম ভাঙল দারোগার। ভুরু ও কপাল কুঁচকে তিনি আস্তে-আস্তে উঠে বসলেন। পা ঝুলিয়ে দিলেন টেবিলের পাশে। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট অতৃপ্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁর ফোলা মুখে। কিন্তু চার জন লোককে দেখতে পেয়ে সেই অভিব্যক্তি চট করে মিলিয়ে গেল।

"ব্যাপার কী?" বাজখাঁই গলায় বললেন তিনি।

"আজ্ঞে, গ্রামে চুরি শুরু হয়েছে।"

"চুরি!" দারোগা হাঁ করে চেয়ে রইলেন। কিছু চিন্তা করছেন যেন। সদ্য জেগে ওঠা মাথা 'চুরি' শব্দটাকে ঠিক করে চিনতে পারছে না বোধ হয়।

"চোর কে?" গম্ভীর স্বরে জানতে চাইলেন দারোগা।

গ্রামের মাতব্বর অনিল চৌধুরী নিচু স্বরে বললেন, "জানা নেই।"

জিজ্ঞাসাবাদ করে যা জানতে পারলেন, তাতে দারোগার হাসি পেল। এমন আজগুবি কাণ্ডের কথা কে কবে শুনেছে! এরা মিথ্যে বলছে না। কিন্তু বুঝেছে ভুল। আসল কেসটা কী, সরেজমিনে তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসবে। তবে এ সবের অভ্যেস নেই বহু দিন। আচ্ছা, বেরিয়েই দেখা যাক। শেষ কবে রোদে বেরিয়েছিলেন, মনেই পড়ে না।

আড়মোড়া ভাঙলেন তিনি। কোমরের বেল্ট টেবিলে রাখা ছিল। দারোগা সেটা হাতে নিলেন পরবেন বলে। পরেও ফেললেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটা উধাও হয়ে গেল। একেবারে কোমর থেকে হাওয়া। ঘটনাটা সকলেরই নজরে

পড়েছে। সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "চোর! চোর! দেখলেন তো!"

"দেখব আবার কী? দেখতে পেলে তো দেখব!" বিরক্ত হয়ে বললেন দারোগা। নিজের উপরেও বিরক্ত। এই মাত্র যা ঘটে গেল, তার কোনও বাস্তব ব্যাখ্যা তিনি ভেবে উঠতে পারছেন না।

"এটাই তো মুশকিল। দেখা যায় না," সমবেত ভাবে বলল চার জন।

॥ ২ ॥

তিন দিন কেটে গেছে। তদন্তের যাবতীয় ধাপ অর্থাৎ সন্দেহজনক ব্যক্তিদের জেরা ও প্রয়োজন মতো বাড়ি খানাতল্লাশি, কিছুই বাকি রাখেননি দারোগা। কোনও কিছুতেই ফল মিলল না। টিকিরও খোঁজ পাওয়া গেল না চোরের। এই বিশাল দেহ নিয়ে এত পরিশ্রম কি আর সহ্য হয়! মনে যতই উৎসাহ থাক, তিন দিনে এতটুকুও সাফল্যের সন্ধান না পাওয়ায় তিনি বেশ মুষড়ে পড়েছেন। এ দিকে চুরি কমার কোনও লক্ষণ নেই। লোকটার কী স্পর্ধা! ভাবলে রীতিমতো চমকে যান তিনি। স্বয়ং দারোগা গাঁয়ে টহল দিচ্ছে। সেই সময়ই একাধিক চুরির ঘটনা ঘটাতে বোধ হয় কেবল সাহসের চেয়েও অতিরিক্ত কিছু লাগে।

এই ব্যর্থতায় গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও নিশ্চয়ই কমে গেছে। তাঁর করারই বা কী আছে? নিজের তরফ থেকে যত দূর করা যায়, তিনি সবই করেছেন। এখন পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে? শহরে যোগাযোগ করে কিছু অতিরিক্ত পেয়াদা আনানো যায়, কিন্তু তাতে সুবিধে হবে কি? মানে, কোমর থেকে বেল্ট চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এই অবিশ্বাস্য দক্ষ চুরি আটকাবেন কেমন করে তিনি! প্রশাসনিক জীবনের অতীত কোনও অভিজ্ঞতাই তাঁকে এই আনকোরা ঝামেলার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর উপযোগী বুদ্ধি সরবরাহ করতে পারছে না। বিছানায় শুয়ে সেই সব নিয়েই ভাবছিলেন। শরীর, মন দুই-ই অত্যধিক ক্লান্ত। তাই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতে দেরি হল না।

অঘোর ঘুমে ঘুমিয়েছিলেন দারোগাবাবু। সময়টা মাঝ রাত। হঠাৎ কেমন যেন অস্বস্তি হওয়ায় ঘুমটা চটকে গেল। চোখ বোজা থাকা অবস্থায় টের পেলেন, ঘরের আলো জ্বলছে। কিছু না ভেবেই পটাং করে চোখ খুললেন। দেখতে পেলেন, ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে আছে এক কিশোর। পাতলা চেহারা। পরনে সাদামাটা পোশাক। কাঁধে ব্যাগ।

অঘোর ঘুমে ঘুমিয়েছিলেন দারোগাবাবু। সময়টা মাঝ রাত। হঠাৎ কেমন যেন অস্বস্তি হওয়ায় ঘুমটা চটকে গেল। চোখ বোজা থাকা অবস্থায় টের পেলেন, ঘরের আলো জ্বলছে। কিছু না ভেবেই পটাং করে চোখ খুললেন। দেখতে পেলেন, ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে আছে এক কিশোর।

চোর-ডাকাত নয়, নিশ্চিত হতে দারোগার মস্তিষ্ক বেশি সময় নিল না। কোন ডাকাতের দায় পড়েছে মাঝ রাতে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার! চিৎকার করে হুলস্থুল করার দরকার নেই। পাশের ঘরে স্ত্রী, সন্তানরা শুয়ে আছে। খামোকা তাদের বিরক্ত করে লাভ নেই।

বিছানায় উঠে বসলেন দারোগা। শান্ত স্বরেই জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুমি?"

"যাকে আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন কয়েক দিন ধরে।"

ব্যাপারটা বুঝতে অল্প সময় লাগল তাঁর। হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমিই তা হলে সব চুরি করেছ?"

"চুরি! সেটা কী?" কিশোরের মুখে নির্ভেজাল বিস্ময়ের ছাপ।

দারোগাকে অপ্রস্তুত দেখাল। একটু ভেবে বললেন, "না-বলে পরের জিনিস নিলে, সেটাকে চুরি বলে। এটা একটা অপরাধ।"

"অপরাধ কেন হতে যাবে?" কিশোর ভারী অবাক হল, "এটা তো কৃতিত্ব।"

"কৃতিত্ব কেমন করে?"

"আপনার শারীরিক ভাবে কোনও ক্ষতি না করে, ভয় না দেখিয়ে আপনার কোনও সম্পত্তি যদি আমি নিয়ে নিতে পারি, তা হলে কৃতিত্ব হবে না?"

"আশ্চর্য! যে ভাবেই নাও না কেন, জিনিসটা তো আমার।"

"আমার বা আপনার বলে কিছু হয় না। জন্মের সময় কি কিছু সঙ্গে করে কেউ নিয়ে আসতে পারে?"

"কিন্তু পরিশ্রম করে প্রাপ্ত জিনিস তো।"

"পরিশ্রম আপনি কী দিয়ে করেন? মাথা অথবা দেহ, তাই তো? এই দুটোও কি আপনার নিজের? কিচ্ছু নিজের নয়," শান্ত গলায় বলল কিশোর। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, এমন কোনও প্রতিষ্ঠিত সত্যই যেন সে বলছে! ভঙ্গিমা থেকে তা-ই পরিষ্কার।

কিশোরের বক্তব্য ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলেন দারোগা। কিন্তু হজম হতে সময় লাগছিল। এ ভাবে কোনও দিন ভেবে দেখেননি তিনি।

"অবশ্য একটা বিষয় আমি বুঝি," কিশোরকে সামান্য চিন্তামগ্ন দেখাল, "এই গ্রহের সামাজিক নিয়ম-কানুন আমাদের তুলনায় ভিন্ন হতেই পারে। তা-ই হয়েছে বোধ হয়।"

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন দারোগা, "কী বলতে চাইছ? তুমি কি অন্য গ্রহের?"

"হ্যাঁ।"

দারোগা হাসলেন, "বিজ্ঞান আমিও পড়েছি অল্পস্বল্প। ভিনগ্রহের প্রাণীকে পৃথিবীর মানুষের মতো দেখতে হবে কেন?"

"হবে না-ই বা কেন?" অবাক দেখাল কিশোরকে, "এই ছায়াপথের বিভিন্ন গ্রহের সম্পর্কে সাধারণ তথ্যাবলি আমাদের পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয়। সেখান থেকে জানতে পেরেছি, অন্তত দশ শতাংশ গ্রহের প্রধান বুদ্ধিমান প্রাণীর বাহ্যিক অবয়ব আপনাদের মতোই।"

"তুমি নিজেকে যা বলে দাবি করছ, তার পক্ষে প্রমাণ কী?"

"তালা লাগানো সদর আর ছিটকিনি

লাগানো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি, সেটাই তো প্রমাণ যে, আমি আপনাদের প্রজাতির চেয়ে আলাদা।"

দারোগা দরজার দিকে দেখলেন। ছিটকিনি এখনও যথাস্থানেই মজুত।

"ঢুকলে কী করে?"

"সব কিছুই তো পরমাণু দিয়ে তৈরি। তাদের মধ্যে ফাঁকও আছে। আমার শরীরের পরমাণুগুলো, দরজার পরমাণুর ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দেওয়া কঠিন কিছু নয়। আমরা পারি। জল দিয়ে একটা দেওয়াল বানানো গেলে, সেই দেওয়ালের কোনও ক্ষতি না করে আপনারাও কি সেটা ভেদ করে অন্য প্রান্তে চলে যেতে পারবেন না? ব্যাপারটা খানিকটা একই ধাঁচের।"

বিস্ময়টা পেড়ে ফেলল দারোগাকে। এখন যেন বিশ্বাস করা খুব একটা সমস্যার বলে মনে হচ্ছে না।

"এখানে আসার কারণ? আর কেউ এসেছে?"

"আমি একা," মুখটা বিষণ্ণ হল কিশোরের, "স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করতে পারিনি। তাই এই গ্রহে আমায় সাময়িক নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। এখানকার লোকেদের এক হাজার জিনিস সংগ্রহ করে দেখাতে হবে। তা হলেই আমার মুক্তি।"

শিউরে উঠলেন দারোগা, "একা! এ কেমন শাস্তি? তুমি তো বিপদে পড়তে পারতে।"

"বিপদে পড়ার আশঙ্কা নেই। সে বিচার করে তবেই নির্বাসনের উপযুক্ত গ্রহ বাছাই করা হয়। তা ছাড়া আত্মরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অস্ত্র আছে আমার কাছে।"

"বেশ। তা হলে তো যে কোনও হাজারটা জিনিস তুলে নিতে পারতে। ইট, কাঠ, পাথর..."

"সংগ্রহ করা কোনও জিনিস প্রকৃতি-সৃষ্ট হওয়া চলবে না। আর প্রত্যেকটা জিনিস ভিন্ন হতে হবে। না হলে তো কাজটা সহজ হয়ে যেত। একটা ইটের পাঁজা উঠিয়ে নিলেই হয়ে যেত।"

"বুঝলাম," দারোগা মাথা নাড়লেন, "তুমি আমার কোমর থেকে বেল্ট খুলে নিয়ে চলে গেলে, দেখতে পেলাম না কেন? অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা রাখো বুঝি?"

কিশোর হেসে বলল, "তা কি কখনও সম্ভব? অদৃশ্য হতে গেলে দেহের সমস্ত উপাদানের মধ্যে দিয়ে আলো যাতে অতিক্রম করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তা হলে চোখের মধ্যে দিয়েও আলো পার হয়ে যাবে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অদৃশ্য হলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধও হবে। সে ক্ষেত্রে লাভ আর কই?"

"রহস্য কী তা হলে?"

"সাধারণ অবস্থায় আপনি যে গতিতে হাত-পা নাড়ানো, নড়াচড়া, হাঁটাচলা করেন, দরকার হলে সেই গতি বাড়াতে পারেন তো?"

"হ্যাঁ। তা পারি," ভেবে বললেন দারোগা।

"আমরাও পারি। তফাত হল, এই বাড়াতে পারা গতির সর্বাধিক মাপ আমাদের জন্য অনেক অনেক বেশি, আপনাদের দেহের তুলনায়। তাই আমি যখন সর্বাধিক গতিতে দৌড়েছি, নড়েছি, তা আপনাদের পক্ষে দেখতে পাওয়া সম্ভব ছিল না।"

দারোগা বিস্ফারিত চোখে বললেন, "ফ্ল্যাশের মতো?"

"ফ্ল্যাশ কে?"

"এক জন কাল্পনিক সুপারহিরো। তোমার প্রজাতির ক্ষমতার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে হুবহু।"

কিশোর সামান্য হাসল। তার পর আলতো গলায় বলল, "আমার মনে হয় কী জানেন, মহাবিশ্ব জুড়ে কোনও প্রাণীর কল্পনা নিছক অবাস্তব হতে পারে না। কোথাও না-কোথাও সমস্ত কল্পনাই সত্যি। বিগ ব্যাং-এর আগের মুহূর্তে আমাদের সকলের চেতনা ও অস্তিত্ব তো একটাই বিন্দুতে জমা ছিল এক সঙ্গে। তার পর তারা যতই আলাদা হয়ে যাক, কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্টের দরুন, একে অন্যের উপর থেকে প্রভাব মুছে দিতে পারে না।"

চমৎকৃত হলেন দারোগা। তার পর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "শাস্তির কোটা পূরণ করে ফেলেছ। আমার কাছে এসে স্বীকার করার কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না তোমার। তা হলে এলে কেন?"

"একেবারেই না-জানিয়ে চলে যাব? তেমন শিক্ষা তো আমরা পাইনি। লক্ষ করেছি, এখানকার বাসিন্দারা আপনার কাছেই আসে বিপদে পড়ে। তাই আপনাকে জানিয়ে দেওয়া সুবিধের মনে করলাম।"

"নেওয়া জিনিসগুলো কোথায়?"

"সঙ্গেই আছে," কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের দিকে ইশারা করল কিশোর।

"এক হাজার জিনিস..." বাক্য অসমাপ্ত রাখলেন দারোগা।

"পদার্থগুলোকে সঙ্কুচিত করে নিয়েছি, মূল গঠন ও বৈশিষ্ট্যের কোনও পরিবর্তন না করেই। দরকারে আগের আয়তনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা খুবই সহজ।"

"ফেরত দেবে না?"

"না," ঘাড় নাড়ল কিশোর, "শাস্তি মকুবের জন্য এগুলো আমাকে জমা দিতে হবে। তা ছাড়া, আমি কারও কাছ থেকেই দামি জিনিস বা প্রতিস্থাপন অসম্ভব, এমন দুর্লভ জিনিস নিইনি।"

"নিজের গ্রহে ফিরবে কী করে?"

"সিগন্যাল পাঠিয়েছি ঘণ্টা খানেক আগেই। আমাকে নিতে যান এল বলে। দেখতে চান?"

দারোগা ছিটকিনি খুললেন। সদরের তালা খুললেন। দু'জনে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল। রাস্তাঘাট শুনশান। সে দিকে কারও নজর নেই। কিশোর উপরের দিকে চাইল। কিশোরের দৃষ্টি অনুসরণ করে, পটাশগড়ের উপরে ঝুলে থাকা আকাশের দিকে তাকালেন দারোগা।

একটা উজ্জ্বল বিন্দু দেখতে পেলেন একখণ্ড মেঘের পাশেই। সেটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। দু'জনের নজর সেঁটে রইল নির্দিষ্ট অভিমুখে।

দারোগা এখনও জানেন না, মহাকাশযানটা আসলে কত বড়। কিন্তু কখনওই তা স্মৃতি হিসেবে এই অভিজ্ঞতা মগজের স্মৃতিদুনিয়ার যতটা জায়গা দখল করে রাখবে আজীবন, তার সমকক্ষ হতে পারবে না।

ছবি: সৌমেন দাস

ধারাবাহিক উপন্যাস (পর্ব ২)

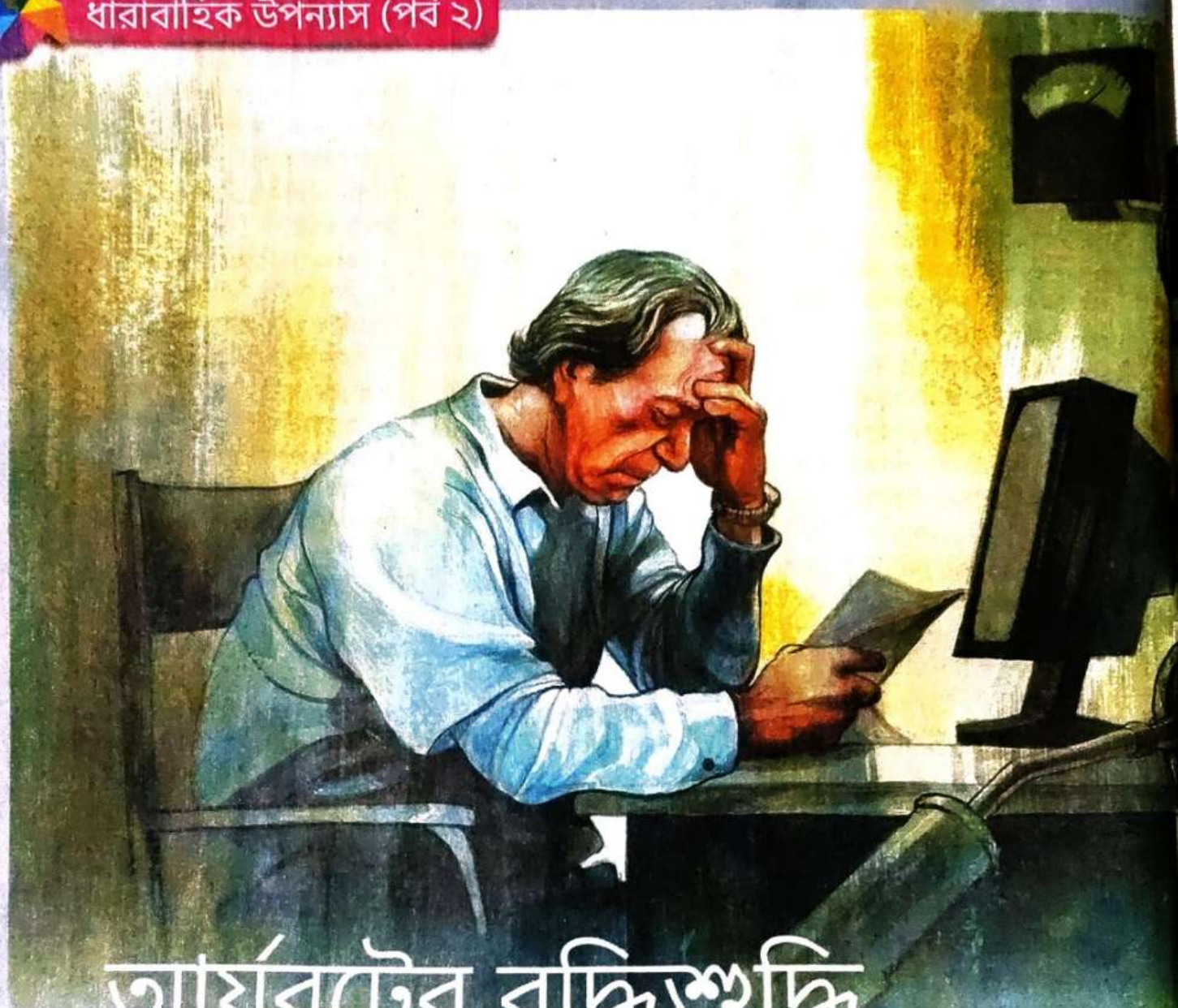

আর্যবটের বুদ্ধিশুদ্ধি

কৃ ষ্ণে ন্দু মু খো পা ধ্যা য়

(আগে যা হয়েছে: সানশাইন অ্যাপার্টমেন্টের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলেন তূর্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ভিতরে ঢুকে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে যেতে গেলে সিকিয়োরিটি গার্ডের বাধার সামনে পড়তে হল ওঁকে। গার্ড ফ্ল্যাটের মালিককে ফোন করতে বললে উনি জানালেন, তাঁর মোবাইল নেই। তখন গার্ডের ফোনে ফ্ল্যাটের মালিককে ধরা হল। ফোন স্পিকার মোডে দিতে জানা গেল, উনি ওই ফ্ল্যাটের মালিক তীর্থঙ্করের বাবা। কমিউনিটি হলে বসে অপেক্ষা করার সময় সামনে পার্ক দেখে বেরিয়ে এলেন তিনি। এমন সময় হঠাৎ এক জন এগিয়ে এসে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। পরিচয় দিল ওঁর প্রাক্তন ছাত্র কিঞ্জল বলে। সে অবাক হয়ে বলল, ওঁর ছেলে এত দিন কাউকে জানায়ইনি বিখ্যাত বাবার পরিচয়। তার পর...)

"হ্যাঁ স্যর। রোজ সকালে ছ'টা নাগাদ আমি মর্নিংওয়াকে বেরোই। আপনার সকালে হাঁটার অভ্যেস থাকলে খেয়াল রাখবেন।"

কমিউনিটি হল থেকে ব্যাগ দুটো নিয়ে সিকিয়োরিটি গার্ড তূর্যনাথবাবুকে পৌঁছে দিল ক্লাস্টার ২-এর লবিতে। লিফ্‌টের সামনে অপেক্ষা করছে অঞ্জনা। বাড়ির কাউকে দেখে বুকের ভিতরটা প্রসন্ন হয়ে উঠল তূর্যনাথবাবুর। জিজ্ঞেস করলেন, "ভাল আছ মামণি? আর সে কোথায়? কিউটি দিদিভাই? প্রথম দেখব ওকে।"

লিফ্‌ট ডাকার বোতাম টিপে অঞ্জনা বলল, "ফ্ল্যাটে

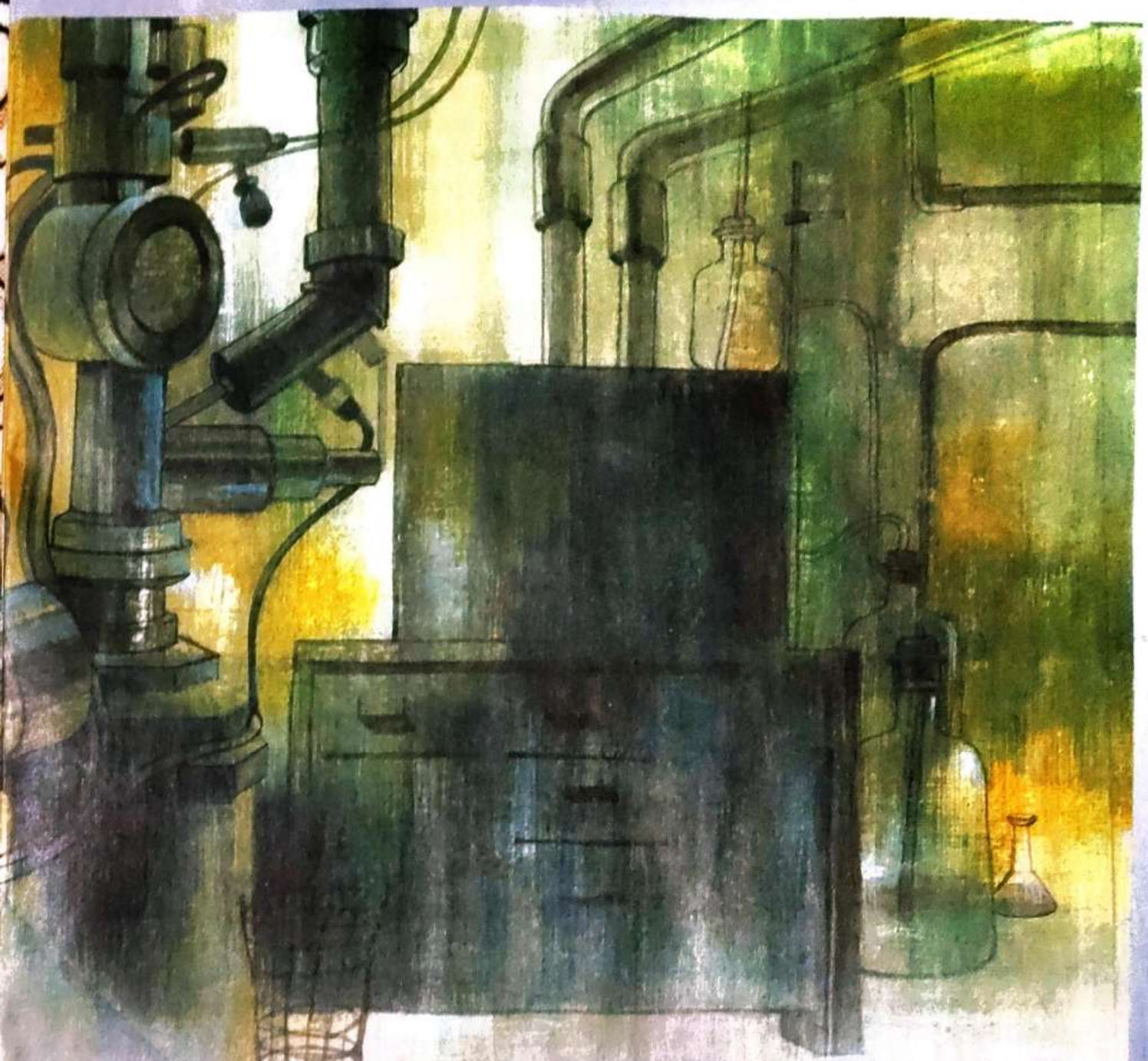

চলুন। বলছি। আপনার তো শনিবারে আসার কথা ছিল বাবা। তীর্থ গিয়ে নিয়ে আসত।"

'টিং' করে আওয়াজ করে লিফটের দরজাটা খুলতে থাকল। সেই আওয়াজে একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোলেন তূর্যনাথবাবু। ফ্ল্যাটের দরজায় লাগানো একটা ক্যামেরার সামনে অঞ্জনা দাঁড়াতেই 'খুট' করে একটা আওয়াজ হয়ে দরজাটা খুলে গেল। ভিতর থেকে একটা যান্ত্রিক গলা ভেসে এল, "ওয়েলকাম অঞ্জনা। ওয়েলকাম গেস্ট!"

॥ ২ ॥

বারো বছর আগে

রাত্রি ক্রমশ গভীর হচ্ছে। গোটা ল্যাবরেটরিতে একটা ছাড়া সব ক'টা আলো নেভানো। যে আলোটা জ্বলছে, সেটা একটা টিউব লাইট। সেই আলোটাও দপ দপ করছে। প্রফেসর ডক্টর তূর্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ছাড়া সকলে অনেক ক্ষণ আগে চলে গেছে। বাইরে কয়েক জন সিকিয়োরিটি গার্ড। তাদের এক জন ঘণ্টা খানেক আগে এসে তূর্যনাথবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল, "স্যর, বাড়ি যাবেন না?"

তূর্যনাথবাবু কোনও উত্তর দেননি। অবশ্য তূর্যনাথবাবুর এ রকম ব্যবহার সিকিয়োরিটি গার্ডরা জানে। নিজের গবেষণা নিয়ে ল্যাবে যখন মগ্ন হয়ে থাকেন, তখন কোনও হুঁশ থাকে না। কে কী জিজ্ঞেস করছে, যেন কানেই ঢোকে না। কাজ সেরে হয়তো কোনও দিন ভোরবেলায় বাড়ি ফেরেন, কোনও দিন আবার টেবিলে মাথা দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েন।

তূর্যনাথবাবুর কাছে কোনও উত্তর না পেয়ে সিকিয়োরিটি গার্ড বুঝে গেল, আজকেও সে রকমই একটা দিন। কিন্তু যেটা বুঝতে পারল না, তূর্যনাথবাবু এখন মনে মনে গবেষণার কথা ভাবছেন না। ভিতরে ভিতরে একদম ভেঙে পড়েছেন। এই ল্যাবরেটরিটা একটু বেশিই সুরক্ষিত। ল্যাবরেটরিতে ঢোকার বেশ কয়েকটা কোলাপসিবল গেট রয়েছে। তার একটা একটা করে বন্ধ করে সিকিয়োরিটি গার্ড বাইরে এসে নাইট ডিউটিতে থাকা অন্য সিকিয়োরিটি গার্ডদের সঙ্গে তাস খেলতে শুরু করল।

তূর্যনাথবাবু একেবারেই মুষড়ে পড়েছিলেন। আজকের দিনটা হতে পারত, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক সোনার অক্ষরের দিন। পৃথিবীর বড় বড় বহু ল্যাবরেটরি কোটি কোটি ডলার খরচ করে আজ পর্যন্ত যা করতে পারেনি, সেটাই সম্ভব করে তুলতে চলেছিলেন কলকাতার এক সরকারি ল্যাবরেটরিতে নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি নিয়ে। বিষয়টা, কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন।

এই অসীম সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে তূর্যনাথবাবুকে দীর্ঘ দিন নিরলস গবেষণা করতে হয়েছে, অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। নিজের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি করতে হয়েছে। পরীক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে একের পর-এক অসফলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু হত্যোদম না হয়ে অসফলতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার পরের পরীক্ষা করেছেন। পৃথিবীর তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরা বিশ্বাসই করতে পারবেন না, কলকাতায় সামান্য একটা ল্যাবরেটরিতে এই পরীক্ষাটি করা সম্ভব। পরীক্ষাটি এতটাই সম্ভাবনাময় যে, সফল হলে তূর্যনাথবাবু পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজও পেতে পারেন।

শেষ মুহূর্তে এ রকম যে একটা ইমেল পাবেন, স্বপ্নেও আশা করেননি তূর্যনাথবাবু। অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এত বছর ধরে গবেষণাটা করছেন। এত দিন প্রতি পর্যায়ে অনুমোদন পেয়েছেন। হঠাৎ চূড়ান্ত পরীক্ষাটা কোনও আলোচনা না করে দুম করে বন্ধ করিয়ে দেওয়া হল।

তবে পরীক্ষার গোটা ব্যাপারটাই অত্যন্ত গোপনীয় রাখতে হয়েছে। সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় তা-ই চায়। পরীক্ষা সফল হলে ভবিষ্যতে তার অনন্ত সম্ভাবনা। উঁচু স্তরের কয়েক জন পদাধিকারী এবং তূর্যনাথবাবুর দু'জন অতি কৃতী ও বিশ্বস্ত ছাত্র, অনির্বাণ আর দীপ্তি ছাড়া আর কেউ জানেন না এই গবেষণা এবং পরীক্ষার বিষয়টা।

আজ ছিল চূড়ান্ত পরীক্ষার দিন। তূর্যনাথবাবু একেবারে নিশ্চিত ছিলেন, আজকের পরীক্ষা সফল হবেই। তবে এই জটিল পরীক্ষা খরচসাপেক্ষ এবং তার একটা বিপজ্জনক দিকও আছে। তাই প্রতিটি পরীক্ষা করার আগে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে যথাযথ অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু আজ শেষ মুহূর্তে উপাচার্যর ইমেলে অত্যন্ত গোপনীয় নির্দেশ এসেছে, এই পরীক্ষা অনতিবিলম্বে বন্ধ করার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিগুলো অকেজো করে দেওয়ার জন্য। সেই সঙ্গে নির্দেশনামাতে এটাও বলা আছে, এই গবেষণা-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ একটি খামে বন্দি করে সিলমোহর লাগিয়ে আগামিকাল সকালের মধ্যে উপাচার্যর কাছে জমা করতে। এই ব্যাপারে কোনও কথাবার্তা যেন তূর্যনাথবাবু ল্যান্ডফোনে অথবা মোবাইলে না বলেন।

শেষ মুহূর্তে এ রকম যে একটা ইমেল পাবেন, স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তূর্যনাথবাবু। অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এত বছর ধরে গবেষণা করছেন। এত দিন প্রতি পর্যায়ে অনুমোদন পেয়েছেন। হঠাৎ চূড়ান্ত পরীক্ষাটি কোনও আলোচনা না করে দুম করে বন্ধ করিয়ে দেওয়া হল। কিছু দিনের জন্য স্থগিতাদেশ নয়, একেবারে বন্ধ। কোনও কারণ লেখা হয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, যন্ত্রপাতিগুলো পর্যন্ত নষ্ট করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইমেলটা পাওয়ার পর অনেক ক্ষণ থম মেরে বসেছিলেন তূর্যনাথবাবু। তার পর ডেকে পাঠিয়েছিলেন অনির্বাণ আর দীপ্তিকে।

অনির্বাণ আর দীপ্তি এসে তূর্যনাথবাবুর চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল, কিছু একটা হয়েছে। আজ বিকেল সাড়ে চারটের সময় চূড়ান্ত পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষার প্রতিটি ধাপ যাতে সুচারু ভাবে রেকর্ড হয়, ল্যাবে নিজেদের ঘরে ওরা সেই প্রস্তুতিই নিচ্ছিল। সেই সঙ্গে ফুটছিল উত্তেজনায়। ডাক পেয়ে তূর্যনাথবাবুর সামনে এসে দাঁড়াতেই ওদের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মাথাটা নামিয়ে নিয়ে এগিয়ে দিয়েছিলেন ইমেলের প্রিন্ট আউট।

অনির্বাণ আর দীপ্তির মুখটাও মুহূর্তের মধ্যে শুকিয়ে গিয়েছিল। চিঠির অক্ষরগুলো দেখে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। ওদের চোখ-মুখ দেখে অসহায় গলায় তূর্যনাথবাবু বলেছিলেন, "আমাকে কারণ জিজ্ঞেস কোরো না। আমার সত্যি জানা নেই।"

তার পর দীপ্তি তো ঝর ঝর করে কেঁদেই ফেলেছিল। সান্ত্বনা জানানোর ভাষা জানা ছিল না তূর্যনাথবাবুর। কিন্তু সরকারি নির্দেশ মানতেই হবে। হাতে সময় কম। দীপ্তিকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন গবেষণার নোটসগুলো গুছিয়ে খামবন্দি করতে। ভাল করে দেখে নিতে, যাতে গবেষণা সংক্রান্ত কোনও এক টুকরো ফটোকপিও অসাবধানে পড়ে না থাকে। কম্পিউটারে যে সব ফাইল আছে, সেগুলো হার্ড ডিলিট করে দিতে। আর অনির্বাণকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যন্ত্রপাতিগুলো বিকল করে দিতে। নিজের হাতে যে যন্ত্রপাতি তিলে তিলে তৈরি করেছিলেন, সেগুলো আবার নিজের হাতেই নষ্ট করে দিতে কিছুতেই পারতেন না।

ল্যাবরেটরির যে অংশে পরীক্ষাটি করা হবে ঠিক হয়েছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছিল কোয়ান্টাম ভল্ট। পরীক্ষাটি করতে একটা বিশেষ পদার্থ লাগে, যার মধ্যে সামান্য তেজস্ক্রিয়তা

আছে। আর লাগে উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ। যন্ত্রাংশগুলো খুলে নেওয়া তাই খুব ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ তেজস্ক্রিয়তা নিরোধক সুট পরতে হয়। সে রকম সুট পরে অনির্বাণ কোয়ান্টাম ভল্টে ঢুকে গিয়েছিল।

দীপ্তি হার্ড ড্রাইভ ফরম্যাট করে এসে তূর্যনাথবাবুকে বলার পর নিজের লকার থেকেও মূল গবেষণার ও পদ্ধতির চূড়ান্ত গোপনীয় ফাইলটি বের করে টেবিলের উপর রেখেছিলেন তূর্যনাথবাবু। পুরো পদ্ধতির কাগজগুলোর মধ্যে পাঁচটি পাতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫ থেকে ৬১। চূড়ান্ত যে পরীক্ষাটি করতে যাচ্ছিলেন, তার প্রাণভোমরা বলা যেতে পারে। সেই কাগজগুলোর উপর এক বার চোখ বুলিয়ে বিড়বিড় করে বলছিলেন, "টেলিপোর্টেশনের যে পরীক্ষা আজকে আমরা সফল করে দিতে পারতাম..."

ধরা গলায় দীপ্তি জিজ্ঞেস করেছিল, "স্যর, আমরা কি কোনও দিনই এই পরীক্ষাটা আর সফল করে দেখাতে পারব না?"

"আমার তোমাদের উপর অগাধ ভরসা আছে, আস্থা আছে। এক দিন তোমরা সফল হবেই। যে ভাবে আমরা সব গুছিয়েছিলাম, সেই মৌলিক ভাবনাটা এখনও কেউ ভাবেনি। ভাবনা কেউ কখনও কেড়ে নিতে পারবে না। শুধু অনুমতি পেলে আবার সব নতুন করে শুরু করতে হবে।"

টেবিলের উপর ফাইলটা দেখিয়ে দীপ্তি জিজ্ঞেস করেছিল, "কিন্তু স্যর, এই সব রিসার্চ পেপার?"

"আদেশনামা আমি মানতে বাধ্য। তবে এটা বলতে পারি, তোমাদের মাথায় যে-ভাবনা বাসা বেঁধে রয়েছে, যে পদ্ধতি তোমরা নিজের চোখে দিনের পর-দিন দেখেছ, আমাকে সাহায্য করেছ, সেটা তো তোমাদের নিজস্ব।"

ইতিমধ্যে অনির্বাণ নিজের কাজ শেষ করে কোয়ান্টাম ভল্ট থেকে বেরিয়ে এসেছিল। অনির্বাণের মুখটাও থম থম করছিল। তূর্যনাথবাবু জানতে চেয়েছিলেন, "সব ডিসম্যান্টল করেছ?"

"হ্যাঁ স্যর। আপনার ব্লুপ্রিন্ট হাতে না পেলে কেউ আর অ্যাসেম্বল করতে পারবে না। আর অ্যাসেম্বল করতে পারলেই বা কী? পদ্ধতিও জানতে হবে।"

"হুম।"

আর কোনও মন্তব্য করেননি তূর্যনাথবাবু।

অনির্বাণ একটু চুপ করে থেকে অনুমতি চেয়েছিল, "স্যর, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? প্রশ্নটা আপনাকে করতে কোনও দিন সাহস করিনি।"

"বলো," খুব শান্ত গলায় তূর্যনাথবাবু বলেছিলেন।

"স্যর, আপনার কিএই পরীক্ষায় আরও কিছু উদ্দেশ্য ছিল, যেটা আমাদের কোনও দিন বলেননি?"

"মানে?"

"লাইভ টেলিপোর্টেশন।"

তূর্যনাথবাবু একটু চমকে হয়ে উঠে গম্ভীর হয়ে উঠে বলেছিলেন, "হঠাৎ তোমার আজকে এটা মনে হল?"

দীপ্তি বলে উঠেছিল, "কী উল্টোপাল্টা বলছিস? এর পর তো বলবি হিউম্যান টেলিপোর্টেশন। কেন কী এটা অবাস্তব। গাঁজাখুরি। স্যর যেখানে আজ করে দেখাতেন একটা লং ডিসট্যান্স টেলিপোর্টেশন, যেটা বিশ্বের কোনও ল্যাব আজ পর্যন্ত করতে পারেনি। ভাল করেই জানিস, কিন্তু সেই পরীক্ষা হত একটা ফোটনের কণা দিয়ে। স্যর পরের ধাপ ভেবে রেখেছিলেন মহাবিশ্বে টেলিপোর্টেশন করতে। পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের।"

অনির্বাণ তূর্যনাথবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "স্যর, আপনার কাছে উত্তরটা পেলাম না।"

তূর্যনাথবাবু বলেছিলেন, "তোমার মনের উপর চাপ বুঝতে পারছি। আমারও আজকে আলোচনা করার মতো মনের অবস্থা নেই। এসো তোমরা। যাওয়ার সময় আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে যাও। আর সিকিয়োরিটি গার্ডদের বলো, কোলাপসিবল গেটগুলো বন্ধ করে দিতে।"

"আপনি যাবেন না স্যর?"

একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে তূর্যনাথবাবু বলেছিলেন, "আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে পরীক্ষাটা বন্ধ করিয়ে সব যন্ত্রপাতি বিকল করতে বলে ফাইল সিল করে নিয়ে নিচ্ছেন কেন? হয়তো এর পিছনে গভীর কোনও চক্রান্ত আছে। তোমরা জানো, এই গবেষণার ফল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুদূরপ্রসারী। আমি নিজে এই ফাইলের প্রথম পাতায় একটা নোট লিখে যাচ্ছি। এই গবেষণা মৌলিক গবেষণা। ভবিষ্যতে এই কাগজগুলো নিয়ে আরও গবেষণার অধিকার শুধু তোমাদের দু'জনের থাকবে। কিন্তু আজকে এই কাগজগুলো পাহারা দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার প্রফেসর-কোয়ার্টারে সে রকম নিরাপত্তা নেই। তাই এগুলো বাড়িতে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। উপাচার্যর অফিসও এখন বন্ধ। আমি কাল সকালে উপাচার্যর কাছে খামটা জমা দিয়ে বাড়ি ফিরব।"

"আমরাও তা হলে থেকে যাই?"

"না, তোমরা যাও।"

অনির্বাণ আর দীপ্তি বেরিয়ে যাওয়ার পর সিকিয়োরিটি গার্ড এসে জিজ্ঞেস করেছিল, "স্যর, বাড়ি যাবেন না?"

তূর্যনাথবাবু মুষড়ে পড়েই বসেছিলেন। তবে মনের মধ্যে অনেক ভাবনা চাগাড় দিচ্ছিল। টেবিলের উপর টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে একদৃষ্টে খামটার দিকে কিছু ক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তার পর খামের মধ্যে থেকে গবেষণার ফাইলটা বের করে পাতা ওল্টাতে থাকলেন। থেমে গেলেন সেই পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫ থেকে ৬১-তে।

টিউব লাইটের দপ দপে আলোয় হঠাৎ মনে হল একটা ছায়ামূর্তি যেন দ্রুত সরে গেল। মনের ভুল? খানিক ভেবে ড্রয়ার থেকে নিজের প্রিয় ওয়াকম্যান বের করে ইয়ারফোন না গুঁজে স্পিকারে ফুল ভলিউমে একটা ক্যাসেট চালিয়ে দিলেন...'মহারাজা! তোমারে সেলাম, সেলাম, সেলাম। মোরা বাংলাদেশের থেকে এলাম...'

(ক্রমশ)

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

কুয়াশা ঘেরা বাংলোয়

কুবলয় বসু

বাংলোটা দেখা মাত্রই পছন্দ হয়ে গেল। রক্তিম চমৎকার জায়গার সন্ধান দিয়েছে। রক্তিম আমার স্কুলের বন্ধু। স্কুলে ওর সঙ্গে অবশ্য পড়াশোনায় রেষারেষির চেয়ে খেলার মাঠে

হাতাহাতি বেশি লেগে থাকত। এক বার খেলতে গিয়ে ল্যাং মেরে ওর পা ভেঙে দিয়েছিলাম। অবশ্য আমার নিজের বেলায় সে রকম ঘটনা অন্য ভাবে এক বার ঘটেছিল কলেজ জীবনে। এক্সকারশানে গিয়ে ক্লাসমেট গৌতমের সঙ্গে বেশ কিছু ব্যাপারে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিলাম। ব্যাপারটা প্রায় মারপিটের পর্যায়ে যাওয়ার আগে বন্ধুরা ছাড়িয়ে নিয়েছিল। গৌতম মনে রেখেছিল। ফিরে আসার পর বাইক চালানো নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে এমন ভাবে চেপে দিয়েছিল যে , বাইক উল্টে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েও প্রায় দু'মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। অনেক চাকরির সুযোগ সে সময় হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিও ছিল। গৌতমের সঙ্গে আজও যোগাযোগ আছে। কিন্তু সেই দিনগুলো ভুলিনি।

স্কুল ছাড়ার পর আর রক্তিমের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। চাকরি-জীবনে প্রবেশ করে দেখি, রক্তিম আমারই অফিসে কাজ করে। স্কুলের বন্ধু এখন সহকর্মী। রক্তিম নাকি প্রত্যেক ছুটিতেই কোথাও না-কোথাও ঘুরতে চলে যায়, সে দু'দিনের ছুটি পেলেও। ও বিয়ে-থা করেনি এখনও। আমিও না। ওর কথা শুনে আমিও মনে মনে ভাবতাম, টুক করে ঘুরে এলে কেমন হয়! কিন্তু ছুটি পেলে দেশের বাড়ি যাওয়ার জন্য মন টানত। মেদিনীপুরের বাড়িতে বাবা-মা রয়েছেন আর ভাই। কিন্তু এ বছর ১৫ অগস্ট সোমবার পড়ায় শনি-রবি আর সোম মিলে সুন্দর একটা ছুটির ব্যবস্থা হয়ে গেল। রক্তিম অগস্টের শুরুতেই ওর পাওনা কিছু ছুটি নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিল কোথায় যেন। তার পর থেকে অফিসে আসেনি। আমারও আর খোঁজ নেওয়া হয়নি। ছুটিতে এক দিন বাড়ি ফিরে ওকে ফোন করব, ঠিক করলাম।

আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই দিন সন্ধেয় রক্তিম নিজেই আমাকে ফোন করল। ফোন ধরেই জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে, সেই যে বেড়াতে গেলি কোথায়, আর তো পাত্তাই নেই!"

ও পাশ থেকে রক্তিম বলল, "আর বলিস না, এত সুন্দর জায়গা যে ফিরে আসতে ইচ্ছেই করছে না।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "তুই এখনও ফিরিসনি! সে কী!"

রক্তিম বলল, "ফিরতেই চাইছি, কিন্তু এখানে এসে ফেরা সত্যিই খুব মুশকিল।"

আমি আমার পরিকল্পনার কথা ওকে বললাম। শুনেই বলল, "এখানে চলে আয়। আমি তো ওই জন্য তোকে ফোন করেছিলাম। এসে দ্যাখ, কী চমৎকার জায়গা। আর ফিরতে ইচ্ছে করবে না।"

আমি হেসে বললাম, "তোর মতো আমিও অফিসে আসা বন্ধ করে দিই, তা হলে চলবে কী করে!"

রক্তিমও আমার কথা শুনে জোরে হেসে উঠল। ওর থেকে সব ডিটেল নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে ট্রেনে চেপে বসলাম। তৎকালে টিকিট পেতে অসুবিধে হয়নি। ফেরার টিকিটও কেটে নিয়েছিলাম। আজ এখানে পৌঁছে বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে সত্যিই মন ভাল হয়ে গেল।

॥ ২ ॥

মিরিক থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পথে গোপালধারা পার করে একটা রাস্তা বাঁ দিক ধরে প্রায় নেপাল সীমান্তের দিকে চলে গেছে। তারই মাঝামাঝি জঙ্গলঘেরা একটা জায়গায় বাংলোটা। এ দিকে লোকজনের চলাচল নেই। আমাকেও বড় রাস্তায় নেমে অন্তত কুড়ি মিনিট হেঁটে এখানে আসতে হয়েছে। মোবাইলের নেটওয়ার্ক প্রায় থাকছে না। রক্তিমকে ফোন করতে পারিনি তাই। বাংলোটা খুব পুরনো। মেরামত হয়নি অনেক দিন। কী রকম প্রাগৈতিহাসিক একটা ভাব রয়েছে! রক্তিম সব ব্যবস্থা করে রাখবে বলেছিল। এসে দেখি সত্যিই দারুণ ব্যবস্থা।

বাংলোর কেয়ারটেকারের নাম উত্তম। নেপালি লোক। আমি যেতেই মহা আপ্যায়ন করে একটা ঘর খুলে দিল। বেশ খোলামেলা ঘর। কাঠের দেওয়াল, মেঝে। এক পাশের জানলা খুলে দিলে পাহাড়ের ও পারে নেপাল দেখা যায়। সামনের দিকটায় সাজানো বাগান। সেখানে বসার ব্যবস্থাও আছে। সব মিলিয়ে সত্যিই ফিরতে ইচ্ছে করবে না। ব্যাগ রেখে জামা-কাপড় বের করতে না-করতেই উত্তম গরম জল এনে দিল। জিজ্ঞেস করলাম, "রক্তিম কোথায়?"

উত্তম এক গাল হেসে চলে গেল। কিছুই বুঝলাম না। স্নান সেরে বেরোতেই দেখি পরোটা-সব্জি আর চা তৈরি। দুপুরে খাবারের কী ব্যবস্থা জিজ্ঞেস করা মাত্রই লম্বা লিস্ট শোনাতে লাগল সে। থামিয়ে দিয়ে বললাম যে, একটা নাগাদ খেতে দিলেই হবে। বাগানে চেয়ার পেতে বসে চা খাচ্ছিলাম। দেখি, রক্তিম হেঁটে আসছে বাংলোর দিকে। আশ্বস্ত হলাম।

রক্তিম গেট খুলে ভিতরে ঢুকে বলল, "খুব অবাক হচ্ছিস না? তোকে বলছিলাম না, এই জায়গাটা ছেড়ে যাওয়া খুব শক্ত।"

আমি হেসে বললাম, "সত্যিই রে, এত সুন্দর জায়গা, অথচ লোকচক্ষুর কেমন আড়ালে। তুই গেছিলি কোথায়?"

উত্তম দেখি আর-এক প্লেট খাবার আর চা এনে হাজির। গোগ্রাসে খেতে খেতে রক্তিম বলল, "একটু বর্ডারের দিক থেকে হেঁটে এলাম। তুই ঠিক চলে আসতে পারবি জানতাম।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এই জায়গার সন্ধান তুই পেলি কী করে?"

ও বলল, "আমার আগের অফিসের এক সহকর্মী দেবদত্ত। সে-ই আমাকে এখানকার কথা বলে। এমনিতে ওর সঙ্গে ভাল বন্ধুত্ব ছিল। বেশ সাদামাটা সহজ, সরল ছেলে। তবে..." থেমে গেল ও।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তবে কী?"

চায়ে চুমুক দিয়ে আয়েশ করে রক্তিম বলল, "হ্যাঁ, এখন বলাই যায়। আগের অফিসে এক বার প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার হিসেবে গরমিল করে টাকাটা নিজে নিয়ে দেবদত্তের ঘাড়ে পুরোটা কৌশল করে চাপিয়ে দিয়েছিলাম। কোম্পানি পুলিশ কেস না করে ওকে সাংঘাতিক অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। পরে জেনেছিলাম তার ক'দিন পরেই..."

কথা শেষ না করেই বাংলোর গেটের দিকে তাকাল রক্তিম। এক জন ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে এলেন। গোলগাল। অল্প

টাক মাথায়। খুব হাসি হাসি মুখ। খালি চেয়ারগুলোর একটায় বসে বললেন, "কী, রক্তিম বুঝি আমার গল্প বলছিল?"

অবাক হয়ে রক্তিমের দিকে তাকালাম। রক্তিম হেসে বলল, "এই হচ্ছে দেবদত্ত। তোকে যে গল্পটা বললাম, তার পর পরই আমিও ওই অফিস ছেড়ে এখনকার অফিসে জয়েন করি। দেবদত্তর ফোন পেয়ে আমি অগস্টের শুরুতে এখানে এলাম।"

আমি খুব হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কী যে হচ্ছে, কিছু মাথায় ঢুকছিল না। জিজ্ঞেস করলাম, "তুই আর কলকাতা ফিরিসনি!"

রক্তিম মাথা নাড়ল, বলল, "ফেরা যায় না। এখানে এলে ফেরা খুব মুশকিল।"

আমি বললাম, "তা যা বলেছিস। মনে হয় এখানে থেকে যাই। এত চমৎকার জায়গা।"

দেবদত্তবাবুও জোরে হেসে উঠে বললেন, "থেকেই যান। আমি থেকে গেলাম। রক্তিম থেকে গেল। আপনি বাদ যাবেন কী করে!"

আমিও ওদের সঙ্গে হেসে উঠলাম। তবে এত পুরনো কথা উঠে আসায় আমারও মনে হচ্ছিল কিছুটা দোষ স্বীকার করে নেওয়া উচিত হবে। আমি কিছু বলার আগেই রক্তিম বলল, "চল, একটু হেঁটে আসা যাক।"

নতুন জায়গা ঘুরে দেখতে ভালই লাগবে। তাই রাজি হয়ে গেলাম। তিন জনে মিলে বাংলো ছাড়িয়ে নেপাল সীমান্তের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতেই রক্তিমকে বললাম, "তোর কথাগুলো শুনে আমারও কিছু বলা দরকার বলে মনে হচ্ছিল। স্কুলে সেই যে ফুটবল খেলতে গিয়ে তোকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিলাম, সেটা উচিত হয়নি। কম বয়স তখন। উত্তেজনার মাথায় আসলে..."

রক্তিম আমার দিকে ফিরে বলল, "তার পর কী হয়েছিল, সেটা জানিস?"

আমি স্বাভাবিক ভাবেই ঘাড় নেড়ে না বললাম। রক্তিম থমথমে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সেই খেলাটা আমাদের হায়ার সেকেন্ডারির টেস্ট পরীক্ষার পর পর হয়েছিল। পা ভেঙে গিয়ে সে বছর আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। পরের বছর মন দিয়ে আর দিতে পারিনি পরীক্ষা। রেজ়াল্ট ভাল হয়নি। বাবা খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আমি কলেজে ঢুকতে না-ঢুকতেই বাবা মারা যান। কোনও রকমে কলেজ শেষ করে কাজে ঢুকি। অনার্সও রাখতে পারিনি। বাবা চলে যাওয়ার পর মায়েরও শরীর ভেঙে পড়ছিল মানসিক যন্ত্রণায়। মা-ও চলে যান। তুই ঈর্ষার কারণে যেটা করেছিলি, সেটা আমার গোটা জীবন তছনছ করে দিয়েছিল। আমি আজও সেটা ভুলতে পারি না।"

আমি ঢোঁক গিললাম। এতখানি জানতাম না। শেষের দিকে রক্তিমের গলাটাও কেমন যেন একটা যান্ত্রিক গলার মতো শোনাচ্ছিল। আরও কুয়াশা আচমকা ঘিরে ধরল যেন কোথা থেকে এসে। রক্তিম বা দেবদত্তবাবু, সকলকেই আবছা দেখাচ্ছিল কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও।

তার মধ্যে থেকেই রক্তিমের গলা ভেসে এল, "অগস্টের শুরুতে দেবদত্ত ফোন করে আমাকে এখানে আসতে বলে। ভেবেছিলাম ভালই হল। অতখানি টাকার কিছুটা ওকেও দেব, যদি আমার মানসিক ভার তাতে কিছুটা কমে! কিন্তু অফিস থেকে ওকে তাড়িয়ে দেওয়ার কয়েক দিন পরে ও অন্যমনস্ক ভাবে রাস্তা পেরোতে গিয়ে আচমকা গাড়ির ধাক্কায়... আমি সে সব খবর পাইনি। এখানে এসে সেটা বুঝলাম। তবে দেবদত্তর সঙ্গে অন্যায় করার শাস্তি আমি এখানে এসে পেয়ে গেছি। এখন আর কোনও সমস্যা নেই। আমরা খুবই ভাল বন্ধু। সেই দলে তোকেও চাই। আসবি না?"

গলা শুকিয়ে আসছিল, তবু কোনও রকমে বললাম, "মানে, কী বলতে চাইছিস!"

কুয়াশা ভেদ করে রক্তিম আমার দিকে এগিয়ে এল। ঠিক যেন রক্তিম নয়, ওর ছায়া। আমি ভয়ে পিছিয়ে গেলাম খানিকটা। রক্তিম বলে চলল, "আমার জীবনটা পুরো শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই অত টাকার লোভ ছাড়তে পারিনি। দেবদত্তর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়েছিলাম। আর এ সবের জন্য যে তুই-ই দায়ী, সেটা তো আমি কখনও ভুলব না। অফিসে তোকে দেখেই ভেবেছিলাম যে, শোধ নিতে হবে। আর দ্যাখ, দেবদত্ত ওর শোধ নিয়ে আমাকেও তার রাস্তা করে দিল।"

আমি পিছিয়ে যাচ্ছিলাম। কী করে পালাব এখান থেকে, বুঝে উঠছিলাম না।

রক্তিম হয়তো সেটা বুঝতে পেরেই বলল, "তোকে বলেছিলাম না যে, এখানে এলে আর ফেরা যায় না। তুইও পারবি না। আয়, চলে আয় আমাদের দলে।"

পিছোতে পিছোতে আচমকা খেয়াল করলাম আমার পায়ের নীচে আর মাটি নেই। খাদের একরাশ কুয়াশা আমাকে টেনে নিল নিজের মধ্যে।

॥ ৩ ॥

সন্ধেবেলা বাগানে বসেছিলাম তিন জনে। উত্তম একটা লন্ঠন এনে রাখল। এই বাংলো উত্তরাধিকার-সূত্রে ওরই। বাংলোয় এক বার ও একা ছিল। ওর স্ত্রী আর ছেলে শিলিগুড়ি গিয়েছিল। শর্ট সার্কিট হয়ে বাংলোয় আগুন লেগে পুড়ে যায়। তার পর থেকে এই বাংলো এ ভাবেই রয়ে গেছে। পরিত্যক্ত।

চুপচাপ বসেছিলাম। মোবাইল বের করে দেখি, নেটওয়ার্ক এসেছে। রক্তিম আর দেবদত্তবাবুর দিকে তাকালাম। ওরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। মোবাইল ঘেঁটে গৌতমের নম্বরটা বের করে ওকে ফোন করলাম। ও ফোন ধরল। বললাম, "কেমন আছিস? তুই এক বার বলছিলি না যে, একটু অফবিট জায়গায় কোথায় বেড়াতে যাওয়া যেতে পারে? তোকে একটা জায়গায় সন্ধান দিচ্ছি, চলে আয়। এলে আর ফিরতে ইচ্ছে করবে না..."

ফোন শেষ করে ফের তিন জনে চুপচাপ বসে রইলাম। কুয়াশা ক্রমশ বাংলো আর আমাদের ঢেকে নিচ্ছিল।

ছবি: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক রোম শহর

মাটি খুঁড়তেই ইতিহাস

রোমে মেট্রোর কাজ করতে গিয়ে পাওয়া গেল প্রাসাদ, ঘর সাজানোর জিনিস। লিখেছেন **শুভশ্রী মুহুরী**

ইস্তানবুলের সমস্যা এ বার রোমে। বছর কুড়ি-বাইশ আগে যখন তুরস্কের রাজধানীতে মেট্রো লাইন বসানোর জন্য খোঁড়াখুঁড়ি চলছিল, তখন বিপদে পড়েছিলেন কর্মীরা। মাটির নীচে নানা ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী উদ্ধার হচ্ছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের আমলের বহু কিছু জিনিস বেরিয়ে আসতে শুরু করেছিল। বাধ্য হয়ে থামিয়ে দিতে হয়েছিল কাজ। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নেমে পড়েছিলেন খনন করতে। তার পর যা উদ্ধার হয়েছিল, তাতে ঐতিহাসিকদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল।

২০১৬ সালে মেট্রোর কাজ শুরু হয়েছিল রোমে। এ এবং বি লাইন চালুও হয়ে গিয়েছে। মুশকিল দেখা দিল সি লাইনের কাজ করতে গিয়ে।

মাটি খুঁড়তে বেরিয়ে এল খোপ কাটা উনচল্লিশটি ঘর। ধুলোপড়া মোজ়ায়েকের কাজ। দেওয়ালচিত্র। দালান। ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকল এমন অনেক কিছু। হবেই তো! রোমের বয়স যে এখন তিন হাজার ছুঁই ছুঁই। ডাক পড়ল প্রত্নতত্ত্ববিদদের। তাঁরা এসে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে জানালেন, এই নিদর্শন প্রায় দুশো বছরের পুরনো মিলিটারি ব্যারাক। আরও কিছুটা মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় জল যাওয়ার নালা।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলেন, প্রাচীনকালে জল নিকাশির জন্য রোমানরা তা তৈরি করে থাকতে পারেন। মেট্রোর কাজ আরও একটু এগোলে বেরিয়ে আসে একটি বাড়ি। অবশ্য বাড়ি না বলে প্রাসাদ বললে আরও ঠিক হবে।

মোজ়ায়েকের ডিজ়াইন, জানলা, ঘর সাজানোর সামগ্রী পরীক্ষা করে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন, প্রাসাদটি সে কালের কোনও ধনী পরিবারের। এর পর মেট্রোর কাজ আরও খানিক এগোলে বেরিয়ে আসে প্রাচীন রাস্তা, সমাধি, মুদ্রা, গয়না— আরও কত কী! প্রত্নতত্ত্ববিদেরা খুব সাবধানে জিনিসগুলো নিয়ে যান পরীক্ষাগারে। দেখা যায়, জিনিসগুলো প্রাচীন রোম নগরীর নিদর্শন।

এ দিকে মেট্রোর কাজ তো বন্ধ। সেটাও ফেলে রাখা যায় না। আবার কাজ শুরু হলে স্থাপত্যের কী হবে! অনেক ভেবে সরকার ঠিক করেছে, আবার নতুন করে হবে মেট্রো লাইনের ম্যাপ। মাটির নীচে যে প্রাচীন নিদর্শন উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে ছুটবে মেট্রো। এতে আবিষ্কারগুলোও অক্ষত থাকবে, যাত্রীরাও ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে পারবে।

২০২৫ সালে হয়তো শেষ হতে পারে মেট্রোর কাজ। সুড়ঙ্গের দু'দিকে থাকবে স্বচ্ছ কাচের দেওয়াল। ইতিহাস দেখতে দেখতে যাত্রীরা পৌঁছোবেন গন্তব্যে।

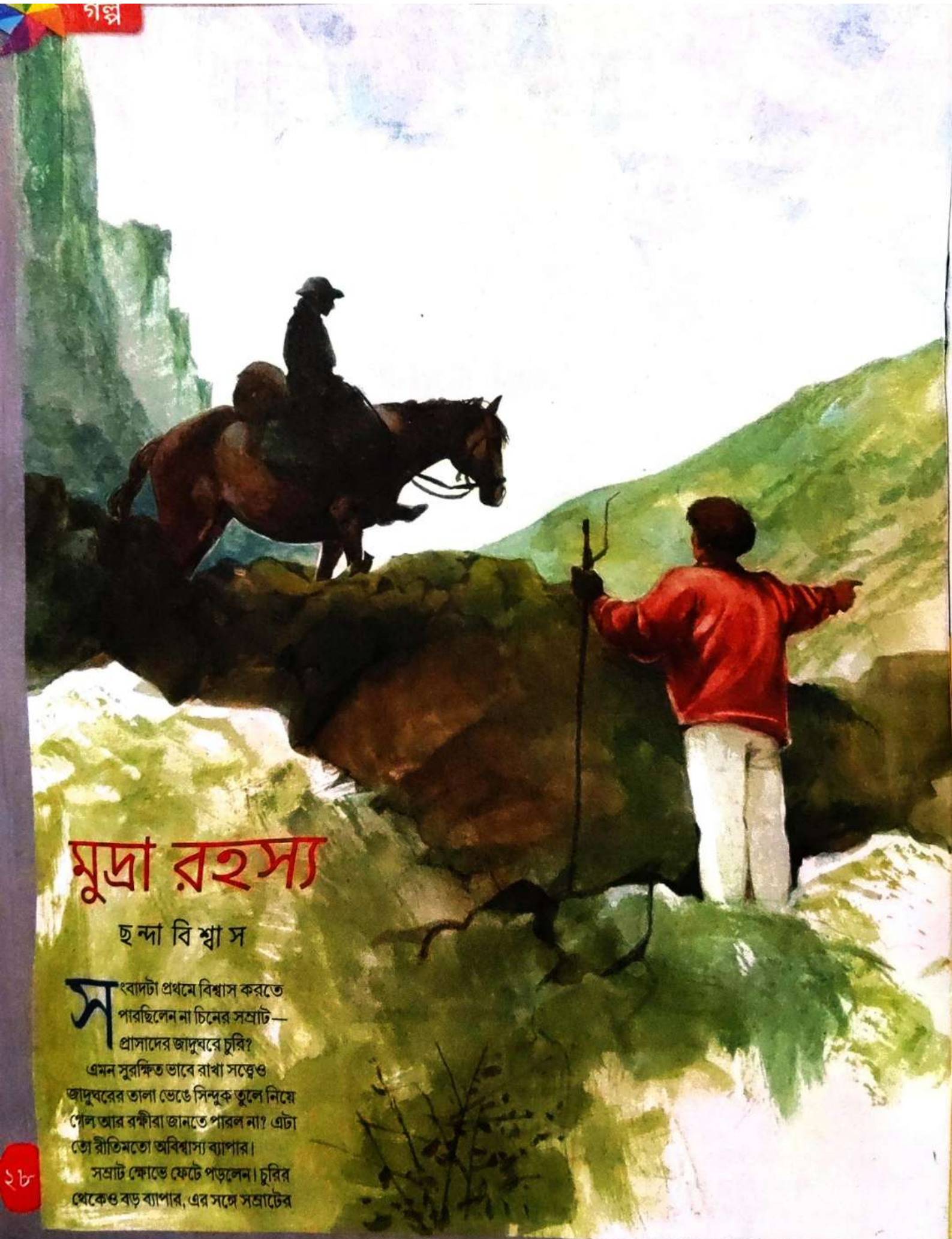

মুদ্রা রহস্য

ছন্দা বিশ্বাস

সংবাদটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না চিনের সম্রাট—প্রাসাদের জাদুঘরে চুরি? এমন সুরক্ষিত ভাবে রাখা সত্ত্বেও জাদুঘরের তালা ভেঙে সিন্দুক তুলে নিয়ে গেল আর রক্ষীরা জানতে পারল না? এটা তো রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

সম্রাট ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। চুরির থেকেও বড় ব্যাপার, এর সঙ্গে সম্রাটের

মান-সম্মান জড়িত আছে। জাদুঘরের সেই সিন্দুকের ভিতরে এমন একটা দুষ্প্রাপ্য জিনিস ছিল, যেটা চুরি যাওয়ায় সম্রাটের রাতের ঘুম উড়ে গেল। যে সে জিনিস তো নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্বর্ণমুদ্রা এই ভাবে হারিয়ে গেল! আর চুরি হল কিনা বেজিং শহরের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন জাদুঘর থেকে। চিন সম্রাট চিন্তিত হলেন। কাবুল সম্রাটের কাছে তিনি মুখ দেখাবেন কী ভাবে? তখন প্রহরীরা কী করছিল?

এক জন প্রহরী জানিয়েছে, তাকে জাদু করে ঘুম পাড়িয়ে নাকি চোরেরা কাজ হাসিল করেছে। অন্য প্রহরী দুপুর-সন্ধের কাজ সেরে ঘরে ফেরার সময় নাকি ছায়ার মতো দু'জনকে দেখেছিল। অন্ধকারের ভিতরে কালো পোশাকে মোড়া। একটু সন্দেহ হয়েছিল এই নিরালায় লোক দু'টিকে দেখে। কিন্তু ব্যাপারটা কী ভাবতে ভাবতেই সেই ছায়ামূর্তি উধাও হয়ে গেল। তবে আরও একটা ব্যাপার সে রাজাকে বলল, সেই রাতে রাস্তায় কোনও পথবাতি জ্বলছিল না। বিশেষ করে জাদুঘর থেকে বেরিয়ে সে যখন প্রধান সড়কে ওঠে। এই দিকটা ছিল জাদুঘরের পিছনের দিক। অন্ধকারে তাকে বেশ সাবধানে পথ চলতে হয়েছিল। অথচ সে শহরের অন্য রাস্তায় পথবাতি জ্বলতে দেখেছিল। জাদুঘরের ঠিক পরের রাস্তাতে কিন্তু আলো ছিল। এখন ওর মনে হচ্ছে এটাও চোরেদের কারসাজি কি না, কে জানে।

চোরেরা যে পিছনের দিকের কাচ ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিল, সে ব্যাপারে সকলেই একমত। কুড়ুল দিয়ে জানলার শক্ত কাচ ভেঙে তবে তারা ঢুকেছিল। জাদুঘরের প্রহরী এবং রাজার বিশেষ রক্ষীরা এসে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখে জানালেন, বেশ রোগা-পাতলা শরীরে কেউ প্রবেশ করেছিল। কিন্তু অত উপরে খাড়া দেওয়াল বেয়ে সে উঠল কী ভাবে? এক জনের তো কাজ নয় অত ভারী সিন্দুক তুলে নিয়ে যাওয়া।

কেউ জানলার কাচ ভেঙেছিল আর কেউ প্রহরীকে অচৈতন্য করে তার থেকে চাবি নিয়ে ভিতরে ঢুকেছিল। বেশ কয়েক জন মিলে এই কাজ করেছিল। কারণ, দ্বিতীয় প্রহরী আসতে মিনিট পনেরো দেরি হয় সে দিন। তার মধ্যেই চোরেরা এই কাজ করে। সিন্দুকে ছিল কাবুল রাজার সম্পত্তি। যার ভিতরে রাখা ছিল ইউক্রাটিডেসের সেই দুর্লভ মুদ্রা। সঙ্গে আরও কিছু জিনিসপত্র চুরি করে পালিয়ে যায়। অনেক প্রশ্নচিহ্ন ঝুলে রইল। সম্রাট চিন্তিত। চিন্তিত গোটা মন্ত্রিমহল।

দ্বিতীয় নৈশপ্রহরী এসে দেখে প্রথম জন অজ্ঞান অবস্থায় পাথরের সিঁড়ির উপরে পড়ে আছে। ভিতরের দরজার তালা ভাঙা। দ্বিতীয় জন তৎক্ষণাৎ খবর পাঠায় রাজ প্রাসাদের রক্ষীদের। তারা ছুটে এসে দেখে সত্যি বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে গেছে। সেই রাতে রাজা আসেন জাদুঘর দেখতে। সকলেই গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন।

পরের দিন জাদুঘরের মূল ফটকের পাহারাদারদের ডাকা হল প্রাসাদে। মন্ত্রীমশাই জিজ্ঞেস করলেন দ্বিতীয় জনকে, "আচ্ছা মিমো, কাল তোমার আসতে দেরি হয়েছিল কেন?"

প্রহরী মিমো জানাল, সে ঠিক সময়েই সে রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। পথে এক জন নিনজার সঙ্গে দেখা। সুগা না রিগা—ঠিক বুঝতে পারল না। সে জানাল, বাড়িতে তার মায়ের খুব অসুখ, আমি যেন কাজকর্ম সেরে তার অসুস্থ মাকে দেখে আসি।

প্রাসাদের অনেকেই জানত, মিমো জড়িবুটি দিয়ে মানুষের রোগ সারায়। অসুখের কথায় মিনিট পনেরো দেরি হয়ে যায়। তার ভিতরে এই ঘটনা ঘটে।

প্রথম জনের কাছে জানতে চাওয়া হয়, সে দিন রাতে কে এসেছিল? এমন এক জন এসেছিল, যে তাকে অচৈতন্য করে ফেলে।

প্রথম জন মাথা নিচু করে ভাবছে। সন্ধের পর পরই জাদুঘরের দরজা-জানলা সব সে নিজের হাতে বন্ধ করে দেয়। তার পরে মূল ফটকেও তালা ঝুলিয়ে সে পাশেই বসে থাকে। রাত বারোটার কিছু আগে ঝুপ করে আলো চলে যায়। চার দিকে তাকিয়ে দেখে, ঘন অন্ধকার। এমন তো কখনও হয় না। ব্যাপার কী বোঝার জন্যে কয়েক পা এগিয়ে রাস্তায় বাতি জ্বলছে কি না দেখতে যায়। ফটকে তখন তালা লাগানোই ছিল। তার পর কয়েক পা যেতেই অন্ধকারের ভিতরে মনে হয়, কালো একটা ছায়ামূর্তি তার মুখের সামনে কিছু একটা বুলিয়ে চলে গেল। হঠাৎ তার কেমন যেন লাগল শরীরের ভিতরে। সে আবার ফটকে ফিরে আসে। আর কিছু মনে নেই। মাথা ঘুরে যায়। এর পরেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

॥ ২ ॥

সে বার বেশ কিছু প্রাচীন এবং দুর্মূল্য সম্পদ নিয়ে কাবুল থেকে পাঠানো হল গিমিত মিউজ়িয়মে। সেখানে তখন বিশ্বের বহু প্রাচীন জিনিসের প্রদর্শনী চলছে। কাবুলের রাজা ভাবলেন, বিশ্বের দরবারে এই সব জিনিস দেখাতে পারলে তাঁর বেশ সুনাম হবে। প্যারিসের সেই শহরে বহু দেশ সে বার অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু রাজা তাতেও ক্ষান্ত হলেন না। তাঁর এ বারে খ্যাতির নেশা চেপেছে। এর পর সেই সব অমূল্য সম্পদ সেখান থেকে চলে এল ওয়াশিংটন ডিসি-র আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনের জন্য। সান

ফ্রান্সিস্কোয় আয়োজিত, 'এশিয়ান আর্ট মিউজ়িয়ম অব সান ফ্রান্সিস্কো'। সেখান থেকে গেল, হিউস্টনের 'মিউজ়িয়ম অফ ফাইন আর্টসে'। এর পর ঘুরতে ঘুরতে এল জার্মানির বন মিউজ়িয়ম এবং সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ। পার্থ থেকে ব্রিটিশ মিউজ়িয়মে। তার পর ইটালি ঘুরে চিনের বেজিং প্রাসাদের জাদুঘরে।

এর পরে ঘটে গেল এক অঘটন। এত সতর্কতা সত্ত্বেও হারিয়ে গেল সেই দুর্মূল্য স্বর্ণমুদ্রাটি। ইউক্রাটিডেসের বহু মূল্যবান অ্যান্টিক মুদ্রা, যাকে বলা হয় 'মোস্ট প্রেসাস কয়েন ইন এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি'। বিশ্বের সব চেয়ে বড় স্বর্ণমুদ্রা বলে পরিচিত সেই মুদ্রাটি। শুধু মুদ্রাটিই নয়, সেই সঙ্গে চুরি গেছে হাতির দাঁতের জিনিস, হিরে, সোনা, রুবি, পান্না এবং রুপোর তৈরি জিনিসও।

চিন সম্রাটের মতে, এত বড় চুরি নাকি চিনের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত ঘটেনি। এই মুদ্রা চুরির জন্যে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে তাঁকে কৈফিয়ত দিতে হবে। কারণ, এটা খাতায়-কলমে কাবুলের সম্পত্তি হলেও এর সঙ্গে পৃথিবীর সকল মানুষের আবেগ জড়িত আছে। এমন মুদ্রা আর কেউ কখনও বানাতে পারেননি যেটা ইউক্রাটিডেস করেছিলেন। রাজা গুপ্তচরদের ডেকে পাঠালেন। তারা সুলুকসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এক দিন তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিল, বেজিং থেকে সামান্য কিছু দূরে নিনপাই গ্রাম। সেখানে বাস করত নিনজাদের দু'টি পৃথক সম্প্রদায়। নিনজারা ছিল মার্শাল আর্টে সিদ্ধ। বিভিন্ন সময়ে তারা তাদের কলাকৌশল দেখাত। অন্যদের শেখাত। চিন এবং জাপানে নিনজারা খুবই বিখ্যাত তাদের মার্শাল আর্টের জন্য। চিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিনজা আর্টের উপরে রীতিমতো শিক্ষা দেওয়া হয়। মধ্য যুগে চিন এবং জাপানে সামন্ত রাজাদের অধীনে থাকত এই সব মার্শাল আর্ট জানা নিনজারা। গুপ্তচর বৃত্তিই ছিল তাদের পেশা। রাজার নির্দেশ মতো কাজ করত তারা। অন্ধকারে নিঃশব্দে ছায়ার মতো তারা ঘুরে বেড়াত আর সংবাদ সংগ্রহ করে রাজাকে দিত। রাজার চরদের অনুমান, এই চুরির পিছনে নিনজাদের হাত থাকলেও থাকতে পারে। কথাটা কানে গেলে রাজা নির্দেশ দিলেন নিনজাদের উপরে লক্ষ রাখতে এবং তাদের ভিতরে কয়েক জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রাসাদে আনতে।

এমন পাঁচ জনকে আনা হল, যারা জাদুঘরে দর্শনার্থীদের মার্শাল আর্ট দেখায়। বছরের পর-বছর ধরে বংশ পরম্পরায় তারা এই খেলা দেখিয়ে আসছে। এরা জাদুঘরের অনেক খবর রাখে।

রাজার অনুচরেরা যখন তাদের ধরে নিয়ে এল, তারা সত্যিই সে দিন

চিন সম্রাটের মতে, এত বড় চুরি নাকি চিনের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত ঘটেনি। এই মুদ্রা চুরির জন্যে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে তাঁকে কৈফিয়ত দিতে হবে। কারণ এটা খাতায়-কলমে কাবুলের সম্পত্তি হলেও এর সঙ্গে পৃথিবীর সকল মানুষের আবেগ জড়িত আছে।

খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল। এটাকে তাদের সম্মানহানিকর প্রস্তাব বলে মনে হল। তারা এক এক জন দক্ষ কলাকুশলী। শুধু বেজিং শহরই নয়, অন্যান্য শহর থেকে লোক আসে তাদের মার্শাল আর্ট দেখার জন্য। তারা একজোট হয়ে সে দিন থেকে সিদ্ধান্ত নিল, তারা আর কেউই জাদুঘরে তাদের কলা প্রদর্শন করতে যাবে না। খবরটা রাজার কানে গেল। রাজা পড়লেন মহা সমস্যায়। বেজিং প্রাসাদের এই জাদুঘরে হাজার হাজার দর্শনার্থী আসেন এই মার্শাল আর্ট দেখতে। রাজা অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাদের পারিশ্রমিক দ্বিগুণ করে দিলেন।

মার্শাল আর্ট-জানা দুই যমজ ভাই ছিল রিগা আর সুগা। বাইরের কেউই বুঝে উঠতে পারত না, কে যে রিগা আর কে যে সুগা। রিগা জাদুঘরে অনেক বছর ধরে আর্ট শেখাচ্ছে। আর সুগার মাংসের ব্যবসা। সে-ও মার্শাল আর্টে পারদর্শী। তবে সে মাংস বিক্রি করে অনেক পয়সা আয় করতে পারে বলে জাদুঘরে পারতপক্ষে আসে না। তবে সুগা, রিগার অসুস্থতার কারণে কয়েক বার এসে আর্ট দেখিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছে।

বাইরে এবং ভিতরের কেউই বুঝতে পারেনি, কে আজ মার্শাল আর্ট দেখাল। সারা শহরে এই সংবাদ ছড়িয়ে গেল। আবার শুরু হয়েছে জাদুঘরে মার্শাল আর্টের প্রদর্শনী। দলে দলে লোকজন এসে আসন গ্রহণ করল। রক্ষীরা তাদের উপযুক্ত জায়গায় বসার নির্দেশ দিল। দর্শকদের মধ্যে তুমুল চাঞ্চল্য দেখা গেল। এ বারে নাকি সুগা দারুণ দারুণ আর্ট দেখাবে। এর আগে তারা বক্সিং, কুং ফু দেখেছে, কিন্তু সুগার সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। সুগা আর রিগা দু'জনেই অসীম সাহসী।

সে দিন ছিল বসন্ত উৎসব। হাজার বছরের প্রাচীন মন্দিরে হচ্ছে লণ্ঠন শো। হাজার হাজার দর্শক সেখানে ভিড় করেছে। সন্ধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল হাজার হাজার লণ্ঠন বাতি। সে একটা দেখার মতো জিনিস। সে দিন রাজা তার পরিবারের সকলকে নিয়ে বহু মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত হয়ে জন সাধারণের সঙ্গে দেখা করেন। তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন। নানা রকম প্রদর্শনী হয়। অনেক রাত পর্যন্ত গানবাজনা, নাচ, খানাপিনা চলে। সকলে দারুণ উপভোগ করে সেই আনন্দ অনুষ্ঠান। তাই সুগা সম্রাটকে জানাল, সে-ও সে দিন উৎসবে গিয়েছিল।

রিগাকে জিজ্ঞেস করা হলে রিগা বলল, তার সে দিন ওই মন্দিরেই মার্শাল আর্ট দেখানোর কথা ছিল। অন্যরাও এক-এক রকম কাজের কথা বলল। যা শুনে সম্রাট বুঝতে পারলেন, এদের কেউই সে দিন এ পথ মাড়ায়নি।

অগত্যা অন্য পথ দেখতে হবে। গুপ্তচরেদের বললেন, যে করেই হোক সেই চোরকে খুঁজে বের করতেই হবে। সকলে তটস্থ হয়ে পড়ল। চোর ধরতে না পারলে তাদের চাকরি তো যাবেই এবং 'লিংচি' নামে কঠোর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। লিংচির নাম শুনে গুপ্তচরেরা শঙ্কিত হলেন। তারা জানেন, যে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হয়, তাকে এই লিংচির মাধ্যমে

নৃশংস ভাবে মেরে ফেলা হয়।

॥ ৩ ॥

চিন সম্রাট উঠে পড়ে লাগলেন। সম্রাট আদেশ দিলেন, যে এই মুদ্রা এনে দিতে পারবে তাকে পুরস্কার স্বরূপ দশ সহস্র 'মাস', অর্থাৎ চিনের মুদ্রা দেওয়া হবে। নিয়োগ করা হল আরও কিছু গুপ্তচর।

সে দিন বেজিং থেকে বেশ দূরে একটি চুনাপাথরের পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক জন ব্যক্তি। আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা। মাথায় ঢেউ খেলানো ধূসর টুপি। চোখে কালো রোদচশমা। হাতে দস্তানা, গায়ে লেদারের জ্যাকেট, কালো ট্রাউজার্স। ঘাড় পর্যন্ত নামানো চুলগুলো একটা ব্যান্ড দিয়ে পনিটেল করে বাঁধা আছে। ঘোড়ার পিঠে চেপে তিনি বহু দূর থেকে এখানে এসেছেন। পাহাড়ের বেশ খানিকটা উপরে এসে একটা সমতল জায়গা দেখে থামলেন। ম্যাপটা খুলে আরও এক বার মিলিয়ে নিলেন। বাইনোকুলারে চোখ রেখেছেন সেই ঘোড়সওয়ার। হঠাৎ তিনি বিস্মিত হলেন, উল্টো দিকের পাহাড়ে সোনার মতো ঝলমল করছে উঁচু ঢিপি মতো অঞ্চল। কী হতে পারে? লোকটির কেমন যেন সন্দেহ হল। কিন্তু ওই দিকে যেতে গেলে খুবই সাবধানে যেতে হবে। পথ খুবই সঙ্কীর্ণ এবং ঢালু।

লোকটি দ্রুত পায়ে নীচে নেমে আসেন এবং সেই জায়গা পেরিয়ে আবার ঘোড়ার পিঠে চেপে বসেন। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে উল্টো দিকের পথ ধরলেন। সামনেই একটি সাঁকো। খুবই পুরনো কাঠের সাঁকো। ঘোড়ায় চড়ে পার হওয়া বিপজ্জনক বলেই তাঁর মনে হল। একটু একটু করে পায়ে হেঁটে পার হওয়াই শ্রেয় মনে করলেন।

নদী পার হয়ে এ পারে আসতেই সেই সোনালি পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল। 'কোথায় হাওয়া হয়ে গেল সেই সুবর্ণ পাহাড়?' লোকটির কপালে ভাঁজ পড়ে।

এ-দিক সে-দিক তাকাতে কয়েক জন বালককে দেখতে পেয়ে সেই দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সেই উজ্জ্বল ঢিপির কথা জিজ্ঞেস করলেন। বালকদের ভিতরে এক জন বলল, "আপনি কি সোনালি ঢিপির কথা বলছেন?"

"ঠিক তা-ই। তুমি জানো, কোন দিকে সেই সোনালি ঢিপি?"

স্থানীয় কয়েক জন মেষপালক বালক এগিয়ে এসে হাত দিয়ে দেখাল, "টিলিয়া টপ তো? ওই তো ওই দিকে, পুবের পাহাড়ের ঠিক উল্টো দিকে।"

"ওই দিক থেকেই তো আমি এলাম।"

"এ বারে যাওয়ার সময় দেখবেন, মূল রাস্তা থেকে বাম দিকে একটা সরু কিন্তু বেশ খাড়া পথ উপরের দিকে উঠে গেছে। ওই পথ ধরে যেতে হবে। তবেই পাবেন টিলিয়া টপের সন্ধান। তবে সাবধান! ওখানে হিংস্র নেকড়ে আছে। বুক চিরে রক্ত খায়।"

ঘোড়সওয়ার "ঠিক আছে," বলে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে বালকদের নির্দেশিত পথ ধরে এগিয়ে গেলেন। কোমর থেকে পিস্তল বের করে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

বেলা শেষের পথে। আলো কমে গেলেও হঠাৎই কিছুটা দূরে সেই উঁচু ঢিপি নজরে পড়ল। বড় বড় পাইন, ওক গাছের জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে। তাই হঠাৎ করে নজরে আসেনি। যত এগোচ্ছেন, ততই তাঁর ভিতরে উত্তেজনা বাড়ছে। কাছে এসে রীতিমতো তাজ্জব হয়ে গেলেন। এ তো স্বর্ণভান্ডার! স্তূপাকার হয়ে আছে রত্নরাশি। তিনি চোখ ফেরাতে পারছেন না। কিন্তু কারা এই সব জিনিস এ ভাবে ফেলে-ছড়িয়ে রেখে গেছে? কোনও ডাকাত কিংবা দস্যুর কাজ হবে। একটু ভয়ে ভয়ে এ-দিক সে-দিক তাকাতে লাগলেন। নিশ্চয়ই তারা আশপাশে কোথাও আছে। তিনি একটা গাছের উপরে চড়ে বসলেন, ব্যাপারটা ভাল করে নিরীক্ষণ করার জন্য। হতে পারে, এই পাহাড়ের গুহার ভিতরেই দস্যুরা তাদের লুণ্ঠন করা জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখে। হঠাৎ তাঁকে আক্রমণ করে না বসে। বেশ কিছুটা সময় চিন্তায় কেটে গেল। এ দিকে সূর্য প্রায় অস্ত যেতে বসেছে। এর পরেই নেমে আসবে ঘন অন্ধকার। তখন তো আর কিছুই দেখা যাবে না। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে খুব সন্তর্পণে গাছ থেকে নেমে এলেন। সোনালি ঢিপির অপর প্রান্তে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন, পর পর চারটি লাশ পড়ে আছে অদূরে। বীভৎস তাদের চেহারা। কারও হাত কাটা পড়েছে। কারও ধড়ের থেকে মুন্ডু আলাদা। কারও হাত-পায়ের নীচের অংশ কাটা। রক্তাপ্লুত চেহারা। হয়তো ভাগ নিয়ে ঝগড়া এবং লড়াই করে মরতে হয়েছে সকলকে। এটা সেটা নাড়তে নাড়তে হঠাৎ দেখতে পেলেন অদূরে একটা মৃতদেহের হাতের মুঠো থেকে বের হয়ে আছে উজ্জ্বল এক বস্তু। তিনি মুঠো থেকে বের করে দেখলেন এবং নিশ্চিত হলেন, এটাই সেই মূল্যবান মুদ্রা। যার এক পিঠে রাজা ইউক্রাটিডেসের আবক্ষ প্রতিকৃতি আঁকা আছে। আর অন্য পার্শ্বে আছে ঘোড়সওয়ারের মূর্তি। উত্তেজনায় তখন সে কাঁপছে। তিনি সাবধানে ইউক্রাটিডেসের সেই দুর্লভ স্বর্ণমুদ্রাটি পকেটে ভরে নিলেন। তার পরে রত্নসমূহ যে কাপড়ের উপরে ঢেলে ডাকাতরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করছিল, সেটি ধরে টানতে টানতে পাশের গুহার ভিতরে রেখে দিলেন। এ বারে গুহার মুখ বড় একটি পাথরখণ্ড দিয়ে বন্ধ করে তার সামনে ডালপালা, জঙ্গল দিয়ে ঢেকে রাখলেন। পরে দেখা যাবে। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ঘোড়সওয়ার পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হলেন।

॥ ৪ ॥

ঘোড়সওয়ার আসলে এক জন চিনদেশীয় গুপ্তচর। তিনি ফিরে গিয়ে সেই বহু মূল্যবান স্বর্ণমুদ্রাটি চিন সম্রাটের হাতে তুলে দিলেন। সম্রাট যখন জানতে চাইলেন, সেই চোর কে? গুপ্তচর জানালেন, সুগা এবং তার সহচররাই সম্ভবত এই কাজ করেছে। কারণ স্বরূপ সে জানাল, সুগা আর অন্য চার জনের মৃতদেহ সে গুহার সামনে পড়ে থাকতে দেখেছে। ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে গিয়ে হয়তো নিজেদের ভিতরে গোলমাল করে একে অপরকে খুন করেছে।

রাজা বললেন, "তুমি সেই পাহাড়ের

ঠিকানা পেলে কী ভাবে?"

গুপ্তচর জানালেন, তিনি বেশ কিছু দিন লক্ষ করেছেন, সুগা হঠাৎ বিত্তশালী হয়ে উঠেছে। তার বাড়িতে প্রচুর ধন-সম্পদ আছে। নিত্যনতুন ঘোড়ায় চড়ছে। এক জন স্বর্ণকার ঘন ঘন তার বাড়িতে যাতায়াত করছে। সাধারণ মাংস-বিক্রেতা এত সম্পদ পেল কোত্থেকে? আর সে হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। ফেরে বেশ কিছু দিন বাদে। মাংসের দোকানটা স্রেফ লোকদেখানো।

দ্বিতীয় কারণ, তিনি সুগার খেলা দেখেছেন। সে টিকটিকির মতো খাড়া দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠতে পারে। জাদুঘরের দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে কুড়ুল দিয়ে কেটে ভিতরে ঢুকেছিল। এখানে সে প্রায়ই খেলা দেখাতে আসত, তাই অনেক কিছুই তার জানা ছিল।

তৃতীয় কারণ হল, প্রহরী মিমোর সঙ্গে সেই রাতে জাদুঘরের পথেই দেখা হয়েছিল সুগা নয়তো রিগার। তাই তিনি এক দিন চুপি চুপি সুগাকে অনুসরণ করে এ পথে এসেছিলেন। কিন্তু পাহাড় পর্যন্ত যেতে না পেরে ফিরে যান দলে অনেক দস্যু দেখে।

সম্রাট সেই মুহূর্তে লোক পাঠালেন সেই টিলিয়া টপে। এই গুপ্তচর মিথ্যাচার করছে কি না, তা প্রমাণ হয়ে যাবে। দুই, সেই টিলিয়া টপে সুগার মৃতদেহ পড়ে আছে, সেটা নিয়ে আসা। সঙ্গের লোকগুলোকে চিহ্নিত করা, যাতে পরবর্তী কালে অনেক চুরি ঠেকানো যায়। এ ছাড়াও আর একটা কারণ হল, পাহাড়ের গুহায় যে রত্নভান্ডার এখনও পর্যন্ত ডাকাতরা লুকিয়ে রেখেছে, সেগুলো অন্যরা হস্তগত করার আগেই যাতে তিনি উদ্ধার করতে পারেন।

লোকলস্কর নিয়ে সেই গুপ্তচর তখনই বেরিয়ে গেলেন। পাহাড়ি পথ ধরে ছুটে চলেছে বারোটি বলশালী ঘোড়া এবং তেজস্বী ঘোড়সওয়ার। সকলের সামনে গুপ্তচর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। লোকজন-সহ হাজির হলেন সেই সোনালি ঢিপিতে। এ বারে চিনতে কোনও রকম অসুবিধে হল না তাঁর।

গুহার ভিতরে ঢুকে গ্যাসের বাতি জ্বেলে যা দেখলেন, তাতে সকলে ভিরমি খেলেন। গুহায় ভিতর বিপুল রত্নসমূহ। এত সম্পদ লুকোনো ছিল, কিন্তু কেউ তার খোঁজ পেল না! এই সুগা যদি স্বর্ণমুদ্রা না চুরি করত, তা হলে তো এর কিছুই জানা যেত না। এর পরে তাঁরা যতটা সম্ভব মণিমাণিক্য নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপালেন। পিছনের ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নেওয়া হল সুগার মৃতদেহ। অন্য মৃতদেহগুলো অন্য একটি ঘোড়ার উপরে বেঁধে চাপিয়ে দেওয়া হল। এ বারে তাঁরা এগিয়ে চললেন। সাঁকোর উপরে উঠে সেই গুপ্তচর আরও এক বার তাকিয়ে দেখলেন সোনালি ঢিপিটার দিকে। বিদায়ী সূর্য তখন পাহড়ের গায়ে শেষ পরশরেখা বুলিয়ে ক্রমে অদৃশ্য হচ্ছে।

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

মজার ঝাঁপি

গিনি যখন বিজ্ঞানী

বইয়ের প্রচ্ছদ

রাজশ্রী বসু অধিকারীর লেখা এই বইয়ে ছ'টি বড় গল্প রয়েছে— 'মিশিরদাদুর শিশি', 'শেয়ালপাড়ার জঙ্গলে', 'বোতলে কার হাত', 'গোলটেবিলের বিজ্ঞানীরা', 'সন্ধ্যাবেলার অতিথি' এবং 'অসম্ভব কি সম্ভব'? ছোটদের জন্য বেশ কয়েক দশক ধরে লিখছেন এই লেখক। কোনও দিনই নিরাশ করেননি। এই বই যার গল্প নিয়ে সেজে উঠেছে, সেই ছোট্ট মেয়ে গিনি কেমন? একটু শোনা যাক...'সকলেরই জীবনে একটা লক্ষ্য আছে। গিনিরও আছে। সে বিজ্ঞানী হতে চায়। শুধু চায় বললে ঠিকমতো বোঝানো যাবে না, বিজ্ঞানী তো হবেই। এটাই দশ বছরের গিনির ভীষণ প্রতিজ্ঞা। গিনির একটু পরিচয় দিয়ে নেওয়া যাক। তার একটা সুন্দর ভালো নাম আছে। যোজনগন্ধা মুখার্জি। এই নামটা সে খুব সুন্দর করে সব বইখাতায় লিখে রাখে।' এইটুকু পড়েই বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে না? এর উপর তো আছে পিকো, গিনির আদরের বিড়ালছানা বা গিনির দাদু, মিশিরদাদু, মহম্মদকাকু আরও কত জন! মজা, রহস্য, বিজ্ঞান অ্যাডভেঞ্চারে ঠাসা এই গিনির গল্প এক বার পড়তে শুরু করলে থামা যাবে না। রূপক নিয়োগীর প্রচ্ছদ ভারী চমৎকার। দেখলেই হাতে তুলে নিতে ইচ্ছে করে।

দাম: ১৯৫ টাকা
প্রকাশক: নৈঋত প্রকাশন

ছড়ায় মোড়া ফুলের তোড়া

ছড়া পড়তে কী মজা, তা-ই না? এখন ভাল ছড়ার বইয়ের খুব আকাল। তবে পার্থপ্রতিম পাঁজার এই ছড়ার বইয়ে তোমাদের মতো ছোটদের ভাল লাগার মতো অনেক ছন্দে লেখা মিষ্টি-মধুর ছড়া রয়েছে। এই কবিতাটাই যেমন... 'দিনের বেলায় এমনি ভালো/ সন্ধে হলে সাত ঝামেলা,/ হারু খুড়োর গানের তোড়ে/ কান ও প্রাণ ঝালাপালা/...' এ রকম মজার লেখা পড়তে কোন খুদে না ভালবাসে? আচ্ছা, দেখো তো এই কবিতাটা কার জন্য লেখা বলতে পারো? 'ছুঁয়ে ফেললেন একশো বছর সাত রাজার ধন এক মানিক, গড়পারেতে আদি বাড়ি চেনো নাকি কেউ খানিক?' আর কেউ না, স্বয়ং সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে লেখা এই ছড়া তোমাদের ভাল না লেগে উপায় নেই। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

বইয়ের প্রচ্ছদ

রণজিৎকুমার রাউতের। ছোটদের বেশ ভাল লাগবে।

প্রকাশক: রোহিণী নন্দন
দাম: ২০০ টাকা

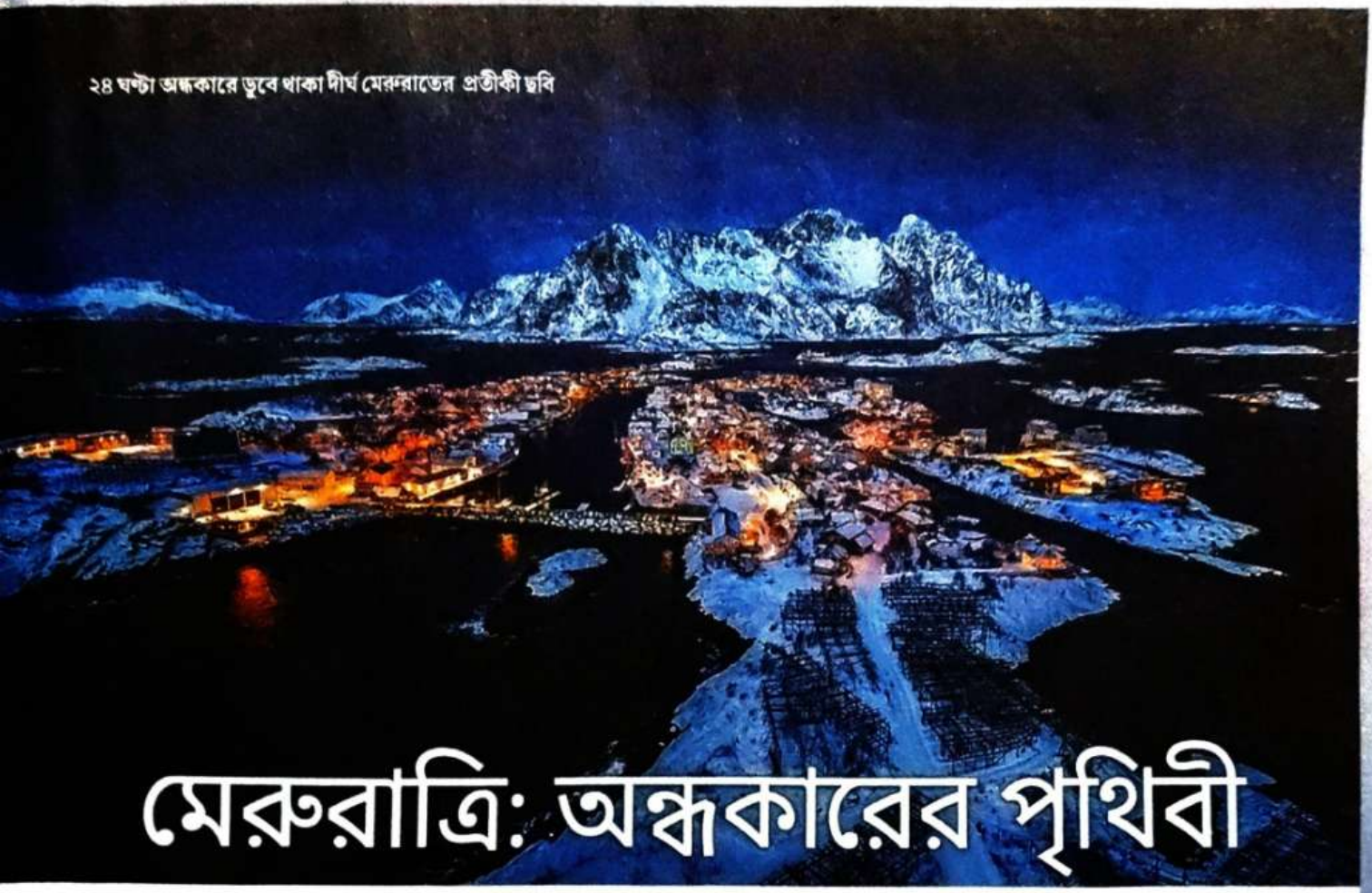

২৪ ঘণ্টা অন্ধকারে ডুবে থাকা দীর্ঘ মেরুরাতের প্রতীকী ছবি

মেরুরাত্রি: অন্ধকারের পৃথিবী

যে দেশে ২৪ ঘণ্টাই দেখা মেলে না সূর্যের, কেমন সেখানকার দিনকাল? লিখেছেন **সুদেষ্ণা ঘোষ**

ইস, শীতের দিনে তাড়াতাড়ি বিকেল হয়ে গেলে কী মনখারাপটাই না হয়ে যায়! ও দিকে এই বিশ্বেরই কোনও কোনও জায়গায় ২৪ ঘণ্টাই গাঢ় রাত। এমন দেশে গেলে তা হলে মন কেমন হতে পারে ভেবেই বিকেল হলে চটপট ঘরের আলো জ্বেলে গরম গরম কফিতে চুমুক দাও আর অবশ্যই মনখারাপকে গোল্লায় পাঠাও। কারণ, মেরুবৃত্ত অঞ্চলে অর্থাৎ আর্কটিক ও আন্টার্কটিক অঞ্চলে বছরে প্রায় ছ'মাস রাত থাকে। আকাশে সূর্যের দেখা নেই। শুধু চাঁদ, তারা এবং মাঝে মাঝে মেরুপ্রভার অপরূপ প্রাকৃতিক আলো! এ ছাড়া আর কোনও আলোই নেই সারা দিন। যেহেতু পৃথিবী তার কক্ষে ২৩.৫ ডিগ্রি কোণ করে ঘুরছে, তাই উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কিছু অঞ্চল হয় একেবারে সূর্যের আলোর কবলে পড়ে, নয়তো পুরোপুরি অন্ধকারে ডুবে যায়। মেরুরাতের সময় সূর্য ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় দিগন্তের নীচে থাকে। যে মুহূর্তে উত্তর মেরু সূর্যের মুখোমুখি হয়, তখন দক্ষিণ মেরুতে মেরুরাত হয়। এর বিপরীতে যখন দক্ষিণ মেরু সূর্যের মুখোমুখি হয়, তখন উত্তরে অন্ধকার থাকে। রাশিয়া, নরওয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, গ্রিনল্যান্ডে মেরুরাত দেখা যায়। গ্রিনল্যান্ডে মেরুরাত প্রায় ৮০-৮৫ দিন স্থায়ী হয়। আর্কটিক মেরুতে ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত মেরুরাত চলে। নরওয়েতে মেরুরাত নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত। নানা দেশে সময়টা আলাদা হয়। তবে এত দীর্ঘ মেরুরাতের ফলে ওখানকার মানুষের নানা সমস্যা হয়। মানুষজন বাড়িতেই বিশ্রাম নিতে পছন্দ করে। কিন্তু এত বিশ্রাম নিলে তো শরীর বেশি ভাল থাকবে না। এই জন্য মানুষজনকে চাঙ্গা করার জন্য নরওয়েতে ম্যারাথন ও অন্য খেলার আয়োজন করা হয়। হয় আর্কটিক স্নো-শু রানও। রাশিয়া, ফিনল্যান্ডে কৃত্রিম আলোয় স্কি করে মন ভাল রাখার ব্যবস্থা আছে। তবে মেরুরাতের অন্যতম সমস্যা এসএডি (সিজ়নাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার) নামে একটি ডিপ্রেশন,যা দীর্ঘ সময় অন্ধকারের জন্য মানুষের মনে দেখা দেয়। অতিবেগুনি রশ্মির অভাবে ওখানে সেরোটনিন হরমোনও (যাকে বলে হ্যাপি হরমোন) কম উৎপন্ন হয়। ফলে চুল কম বাড়ে। হজমের গোলমাল হয়। ভাল ভাবে বাঁচার জন্য বেশি করে শারীরিক চর্চা এবং সাংস্কৃতিক-সামাজিক অনুষ্ঠানে বেশি করে যোগ দিতে হয়। আলোর সঙ্গে এনার্জির সম্পর্ক দৃঢ়। তাই প্রাকৃতিক সূর্যালোকের মতো মেরুরাতের দেশে ডেলাইট ল্যাম্পের চল আছে। এ তো গেল রাতের কথা। মেরু গ্রীষ্মের সময় আবার সূর্য দিগন্তের উপরে থাকে ২৪ ঘণ্টা। যার অর্থ অবিচ্ছিন্ন দিনের আলো। আর শোনো, মেরুতে শীত ও গ্রীষ্ম প্রধান ঋতু। 'শরতে আজ কোন অতিথি' বা 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' গানগুলো এখানে গাওয়াই যাবে না। কারণ, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মতো শরৎ, হেমন্ত, বসন্তের দেখা কিন্তু এখানে মিলবেই না কখনও।

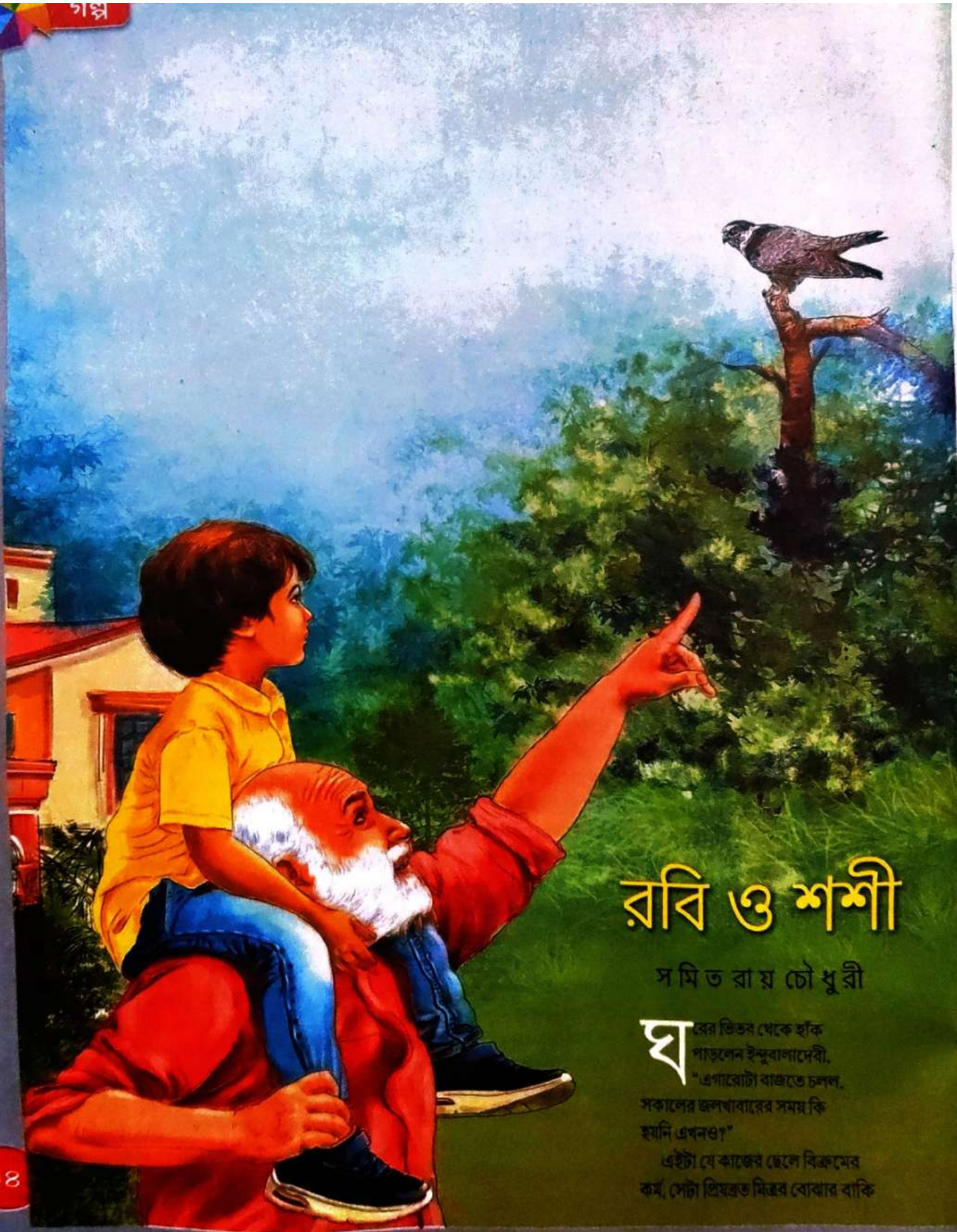

রবি ও শশী

স মি ত রা য় চৌ ধু রী

ঘরের ভিতর থেকে হাঁক পাড়লেন ইন্দুবালাদেবী, "এগারোটা বাজতে চলল, সকালের জলখাবারের সময় কি হয়নি এখনও?"

এইটা যে কাজের ছেলে বিক্রমের কর্ম, সেটা প্রিয়ব্রত মিত্রর বোঝার বাকি

নেই। সে নির্ঘাত মনে করিয়ে দিয়েছে কথাটা। বিক্রম সব সময় মিত্রবাবুর কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মিত্রবাবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। তিনি এই বিক্রমকে ভীষণ ভয় পান। ইন্দুবালার গোয়েন্দাগিরি থেকে শুরু করে সব কিছু করে দেয় এই বিক্রম। সুবোধ বালকের মতো হাত-পা ধুয়ে সামনের ঘরে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসে পড়লেন মিত্রবাবু। ইন্দুবালাদেবী খাবার দিতে দিতে বলতে থাকলেন, "আজ সকালে কি সেই হরবোলা এসেছিল?"

মাথা নুইয়ে মিত্রবাবু বললেন, "না, আসেনি।"

পাশের ঘর থেকে বিক্রম বলে উঠল, "দাদাবাবু তো আজকে সুয্যি ওঠার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে গেছেন।"

ইন্দুবালাদেবী আর-একটু রাগ দেখিয়ে বললেন, "তা হলে তুমি আমাকে মিথ্যে বলা শুরু করেছ? আর কত টাকা খোয়াবে এই সবের পিছনে?"

মিত্রবাবু চুপ করে রইলেন। তিনি বুঝে গেলেন, সব বিক্রম লাগিয়েছে। আজকে কালু হরবোলা শেষ রাতে এসেছিল। কালুর কাছ থেকে মিত্রবাবু পাখিদের ভাষা শিখছেন সকলের চোখ এড়িয়ে। গত কয়েক মাস কেউ ধরতে পারেনি। আজ বিক্রম হয়তো দেখে ফেলেছে।

মিত্রবাবু অবসর নেওয়ার পর শহর থেকে কিছুটা দূরে নতুন শহরতলিতে সারা জীবনের জমানো টাকা দিয়ে বাড়ি করেছেন। স্ত্রী ইন্দুবালা আর কাজের ছেলে বিক্রম তাঁর সঙ্গে এই বাড়িতে থাকে।

"আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে মিতু আর লাট্টু আসবে। এক মাস থাকবে। জামাই অফিসের কাজে বিদেশ যাবে। সেই সময়টা তারা এইখানে থাকবে। তাদের সামনে এই সব পাগলামি করবে না।"

ইন্দুবালাদেবীর ঝাঁঝালো কথাগুলো মিত্রবাবু চুপচাপ হজম করলেন।

তাদের একমাত্র মেয়ে মিতু তার স্বামীর সঙ্গে থাকে দিল্লিতে। তাদের এক ছেলে লাট্টু। মিতু বছরে এক-আধ বার আসে এই বাড়িতে।

চাকরি থেকে অবসরের পরও মিত্রবাবু চালিয়ে যাচ্ছেন পরিবেশ নিয়ে গবেষণার কাজ। এই বাড়িতে বিভিন্ন গাছপালা, ফুল-ফল, পোকামাকড় থেকে শুরু করে পশু-পাখি যা-ই আসে, তাদের উপর চলে পর্যবেক্ষণ আর গবেষণা। সারা দিন ছোট্ট নোটবুকে টুকে রাখেন সব কিছু।

॥ ২ ॥

কালু হরবোলা বিভিন্ন পশু-পাখির ডাক নকল করতে বেশ পারদর্শী। এলাকায় খুব নামডাক। পাখির মিষ্টি ডাক থেকে শুরু করে বন্য জন্তুর বিকট চিৎকার, সব নিখুঁত ভাবে করতে পারে সে। কালো লিকলিকে চেহারা হলেও গলায় তার ভারী জোর। সারা বছর খাকি হাফ প্যান্ট আর খাকি হাফ শার্ট পরে থাকে। শীত-গ্রীষ্ম তার গায়ে লাগে না। বাজার-ঘাটে, রাস্তার ধারে বসে বিভিন্ন পশু-পাখির ডাক হাঁকে। তাতেই মানুষ সন্তুষ্ট হয়ে যা পারে তা দেয়। সেই দিয়েই কালু হরবোলার চলে যায়।

এক শীতের ভোরে মিত্রবাবুর সঙ্গে কালু হরবোলার প্রথম দেখা হয়। কালুর কষ্ট দেখে মিত্রবাবু তার পুরনো ছেঁড়া হনুমান টুপি দিয়ে দিলেন। শীতের জন্য না হলেও রংটা পছন্দ হওয়ায় কালু বেজায় খুশি হয়ে যায়। সেই থেকে তাঁদের বন্ধুত্ব জমে ওঠে। কিন্তু সেই খবর বাজার থেকে আমদানি করে আনল বিক্রম। ইন্দুবালাদেবীর কড়া নির্দেশ, কালুর সঙ্গে মেশা যাবে না। তাই গত তিন-চার মাস ধরে তাঁদের লুকিয়ে দেখা করতে হয়।

মিত্রবাবুর কাছে কালু হরবোলা কোনও জীববিজ্ঞানীর থেকে কম নয়। ভোর রাতে মিত্রবাবুর বাড়ির পিছনের বাগানে কালু এসেছে। পাখিদের ভাষা শিখিয়ে দিচ্ছে মিত্রবাবুকে।

"বাবু, ভোরবেলা হচ্ছে পাখিদের ভাষা শেখার আদর্শ সময়। এই সময় মা-বাবা পাখিরা তাদের সন্তানদের নিয়ে পাঠশালা বসায়। তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ শেখায়। তাতে মনোযোগ দিলে আমরাও তাড়াতাড়ি শিখতে পারব।"

কালুর কথা শুনে মিত্রবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কত ধরনের পাখির ভাষা বুঝতে পারো?"

"সে দেড়শো-দুশো তো হবেই। আজকাল তো অনেক পাখি দেখাই যায় না। তাদের ভাষা ভুলে যাচ্ছি।"

"তুমি সকলের নাম জানো?"

"হ্যাঁ। নাম না জানলে হবে? সকলের নাম জানি। দেখলেই চিনতে পারি। অনেক পাখি বেশ লাজুক হয়। ডাকলেও সামনে আসতে চায় না। অনেক পাখি অনেক অনেক দূর থেকে আসে।"

"অনেক দূর? মানে, কত দূর?"

মিত্রবাবুর কথা শুনে কালু তার সাদা ধবধবে উঁচু দাঁতগুলো বের করে হেসে বলল, "সে অনেক দূরের দেশ বাবু, সাইবেরিয়া, কোরিয়া, জাপান আরও অনেক জায়গা। তারা শীত সহ্য করতে পারে না, তাই চলে আসে।"

এমন সময় হলুদ গায়ে চকলেট রঙের দাগ কাটা দুটো পাখি চাঁপা গাছটায় এসে বসল।

কালু সঙ্গে সঙ্গে 'ক্রি-ক্রি' করে ডাক দিল। একটি পাখি ঝুপ করে কালুর কাঁধে এসে বসল। কালু মিত্রবাবুকে বলল, "এর নাম বৌ কথা কও।"

মিত্রবাবু হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন কালুর দিকে। কত কিছু জানে সে! কত জ্ঞানী! বসন্তবৌরি, মুনিয়া, বাতাসি, নীলকণ্ঠ কত পাখিদের নাম যে সে জানে! সকলকে চেনে। সকলের ভাষা জানে।

মিত্রবাবু কালুর কাছে পাখিদের ভাষা শিখতে শুরু করলেন। পাখিদের যে কত কথা থাকে! কাক থেকে বাড়ির সিলিংয়ের উপরের পায়রা, সকলের কথা শিখতে শুরু করলেন।

॥ ৩ ॥

অক্টোবর মাস চলছে। এখন তিনি

মজে আছেন লাউ গাছের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে। সূর্যের আলোর সঙ্গে গাছ কোন অ্যাঙ্গেলে থাকলে লাউ তাড়াতাড়ি বড় হবে, তা বের করার প্রয়াস চলছে মিত্রবাবুর। দু'-তিন সপ্তাহ ধরে কালুরও দেখা নেই।

এক দিন ভোর রাতে ঘরের মধ্যেই মিত্রবাবু পায়চারি করছেন। তখনও বাইরে বেরোনোর সময় আসেনি। এমন সময় পিছনের বাগান থেকে কোকিলের ডাক। মিত্রবাবু খুব খুশি হয়ে উঠলেন। কালু এসেছে। অক্টোবরে শীত পড়েনি। এখনও অনেক বাড়িতে সিলিং ফ্যান চলে। কিন্তু শীতকাতুরে মিত্রবাবু নিয়ম মেনে চাদর, মোজা, মাফলার, হনুমানটুপি পরে বেরিয়ে পড়লেন কালুর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

কালু মিত্রবাবুকে দেখেই বলে উঠল, "বাবু, এই পাড়ায় দুটো বিদেশি পাখি এসেছে। খুব দূর থেকে। আরও দূরে যাবে তারা। তাদের সঙ্গে কথা বলবেন?"

মিত্রবাবুর আনন্দে চোখ চকচক করে উঠল, "কোথায় তারা?"

মিত্রবাবুর কথা শুনেই কালু হাত উঁচিয়ে দেখাল, "ওই দেখেন।"

তখন আকাশ একটু একটু ফরসা হচ্ছে। পাশের বাড়ির ছাদের উপর একটা মোবাইল টাওয়ারের উপর দুটো মাঝারি আকৃতির বাজপাখি। মিত্রবাবু তা দেখে একটু হতাশ হয়ে বললেন, "এ তো বাজপাখি। হামেশাই দেখা যায়।"

কালু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "আরে না, সব বাজপাখি কি এক গোত্রের নাকি? তারা মঙ্গোলিয়া থেকে এসেছে। এই যাত্রায় প্রায় বাইশ হাজার রাস্তা পাড়ি দেবে।"

"তাই নাকি? কোথায় যাবে তারা?"

কালু বলল, "তাদের নাম, আমুর ফ্যালকন। মোঙ্গল দেশের পাখি তারা। মোঙ্গল দেশে খুব ঠান্ডা। এখন বরফ হয়ে যাবে সব। তারা এখন সাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকায় চলে যাবে। সেখানে শীতকালটা কাটাবে।"

"ভারী মজা তো তাদের। তুমি জানো কী ভাবে?"

"আমি সব পড়েছি। পশু-পাখির প্রেমে পড়ে আমার সব পড়া হয়ে গেছে।"

কালুর কথাটা শুনে মিত্রবাবু বললেন, "কোথায় পড়েছ?"

"আমার গুরুদেব ছিলেন বিখ্যাত এক জন পক্ষিবিদ। বরানগরে তাঁর বাড়ি। তিনি এখন নেই। তাঁর বাড়িতে আছে এক বিশাল লাইব্রেরি। সেখানকার সব বই আমার পড়া হয়ে গেছে। এখনও মাঝে

এক দিন ভোর রাতে ঘরের মধ্যেই মিত্রবাবু পায়চারি করছেন। তখনও বাইরে বেরোনোর সময় আসেনি। এমন সময় পিছনের বাগান থেকে কোকিলের ডাক। মিত্রবাবু খুব খুশি হয়ে উঠলেন। কালু এসেছে। অক্টোবরে শীত পড়েনি। এখনও অনেক বাড়িতে সিলিং ফ্যান চলে।

মাঝে যাই। নতুন বই এলে পড়ে আসি।"

মিত্রবাবু হাঁ করে কালুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"কথা বলবেন? তাদের সঙ্গে? তা হলে ডাকছি," বলেই কালু ডাক দিল, "ও-ক্রি-ক্রি-ক্রি।"

অমনি বাজপাখি দুটো উড়ে এসে মিত্রবাবুর লাউ গাছের বাঁশের মাচার উপর বসল। ঘাড়টা ঘুরিয়ে এক চোখে দু'জনকে দেখল। কালু বিভিন্ন শব্দ করে কথা শুরু করল। তখনই সকাল সকাল বাগানের দিকে বিক্রমের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। পাখি দুটো সতর্ক হয়ে আচমকা উড়ে চলে গেল দূরে মোবাইল টাওয়ারের উপর। এর পর কালু বলল, "তারা দু'জন আরও কিছু দিন থাকবে। তার পর চলে যাবে সাগরের উপর দিয়ে। আফ্রিকা মহাদেশের সোমালিয়ায়।"

মিত্রবাবু শিশুর মতো বলে উঠলেন, "ইস, আমরা যদি তাদের মতো হতে পারতাম! উড়ে চলে যেতে পারতাম তাদের সঙ্গে।"

কালু একটু উদাস হয়ে বলল, "রাস্তায় তাদের ভারী বিপদ হয় বাবু।"

মিত্রবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন বিপদ?"

"অনেক জায়গায় মানুষ তাদের মেরে খেয়ে ফেলে। কোনও দেশে তাদের বন্দি বানিয়ে পোষ মানায়। আরও অনেক বিপদে পড়তে হয় তাদের।"

কালু আরও বলল, "কিছু দিন থাকবে তারা। সকাল সকাল চলে আসব। তাদের ভাষা শিখিয়ে দেব। বেশ ভাল লাগবে।"

মিত্রবাবু আনন্দে শিশুর মতো বলে উঠলেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

এই ভাবে প্রায় প্রতি দিন চলতে থাকল আমুর ফ্যালকনের সঙ্গে মিত্রবাবুর কথা বলার চেষ্টা।

॥ ৪ ॥

দেখতে দেখতে চলে এল ফেব্রুয়ারি মাস। মিতু আর তার ছেলে লাটুর জন্য বাড়ি সারা ক্ষণ গমগম করে। কালু আর আসে না। মিত্রবাবুর দিনও ভালই কাটছিল, নাতি লাটুকে নিয়ে। মিত্রবাবুর সমস্ত গল্প আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের বিশ্লেষণ সে খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে।

মিত্রবাবু লাটুকে পাখিদের গল্পও শোনালেন। আমুর ফ্যালকনদের গল্পও শোনালেন। পাখি দুটো চলে যাওয়ার আগে তাদের নামও দিয়েছিলেন মিত্রবাবু। একটার নাম রবি, আর-একটার নাম শশী। তারা এই সময়টায় আফ্রিকা থেকে ফিরে আসবে। আবার এইখানে কিছু দিন থেকে চলে যাবে মোঙ্গল দেশে। দাদু আর নাতির মধ্যে শর্ত ছিল, এই কথা বাড়ির আর কাউকে বলা যাবে না।

এক দিন সকালে লাটু বলল, "দাদু,

মনে হয় তারা এসেছে। টাওয়ারের উপর দেখা যাচ্ছে।"

লাট্টুর কথা শুনে মিত্রবাবু উৎসাহ নিয়ে দেখলেন, "হ্যাঁ, একটা এসেছে। এই তো রবি! শশী কোথায়? দেখা যাচ্ছে না তো।"

লাট্টুর আর তর সইছে না, "দাদু, তাকে ডাকো না। জিজ্ঞেস করো কেমন আছে তারা।"

মিত্রবাবু বললেন, "তারা মাটির কাছে বেশি আসে না। উপরে উপরে থাকে। ঠিক ভাবে ডাকলে নীচে নামবে। আচ্ছা, আমি চেষ্টা করছি।"

মিত্রবাবু এই বার ডাক দিলেন, "ও-ক্রি-ক্রি-ক্রি।"

সঙ্গে সঙ্গেই রবি নীচে নেমে এসে বসল। ঘাড় কাত করে এক চোখে মিত্রবাবু ও লাট্টুকে দেখল। মিত্রবাবুর সঙ্গে কিছু কথা বলল। লাট্টু হাঁ করে শুধু মিত্রবাবুর দিকে এক বার, আর-এক বার রবির দিকে দেখতে লাগল।

মিত্রবাবুর দু' চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। লাট্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শশীকে ওরা মেরে ফেলেছে।"

হাউমাউ কান্না শুনে ইন্দুবালাদেবী, মিতু, বিক্রম সবাই হাজির।

মিত্রবাবুর মুখে শুধু একই কথা, "ওরা মেরে ফেলল শশীকে।"

মিতু বলে উঠল, "বাবা, বাইরে রোদ অনেক। আমি মাথায় জল ঢেলে দিচ্ছি। তুমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকো।"

ইন্দুবালাদেবী বলছেন, "এই বয়সে মাথাটা গেল। আমার যে আরও কত কিছু দেখতে হবে। ভগবান, রক্ষা করো।"

বিক্রম পিছন থেকে ফোড়ন কাটল, "আমি তো অনেক দিন ধরেই বলছিলাম, দাদাবাবুকে মাথার ডাক্তার দেখানোর দরকার।"

লাট্টু শর্ত মেনে কাউকেই কিছু বলল না। কিন্তু মিত্রবাবুর কান্না আর থামছে না।

বিকেলের মধ্যেই পাড়ার সকলে জেনে গেছে, মিত্রবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মানুষজনে বাড়ি ভরে গেল। শহরের নামী সাইকায়াট্রিস্ট ডক্টর মজুমদারকে দেখানো হল। ডাক্তারও কিছু ধরতে পারলেন না। কারণ, মিত্রবাবু বা লাট্টু কেউই কিছু বলল না।

ঘুমের ওষুধ খেয়ে ভোর রাতে আর ঘুম থেকে উঠতে পারলেন না। সকালবেলা উঠে নিজের ঘর থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতেই বুঝতে পারলেন, দরজা বাইরে থেকে আটকানো। মা-মেয়ের মন খারাপ। বসার ঘরে বসে আছে।

মিত্রবাবু ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে দেখলেন, রবি আকাশে একা-একা চক্কর কাটছে। এত দূরেও রবির চোখে জল দেখতে পাচ্ছেন মিত্রবাবু।

লাট্টুর দাদুর সঙ্গে কথা না বলতে পেরে মন খুব খারাপ। চুপি-চুপি পিছনের বাগানে গিয়ে রবির দিকে তাকিয়ে ও ডাক দিল, "ও-ক্রি-ক্রি-ক্রি..."

ছবি: সমরজিৎ রজক

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলি

▶ আনন্দমেলায় গল্প পাঠাতে হবে ডাকে কিংবা ইমেলে। পত্রিকা দফতরের রিসেপশনে এসেও গল্প জমা দিতে পারেন।

▶ ডাকে কিংবা দফতরে জমা দিলে গল্পটি হাতে লিখে কিংবা কম্পিউটারে কম্পোজ় করে প্রিন্ট আউট নিয়েও পাঠাতে পারেন। তবে লেখাটি মনোনীত হলে তখন ইউনিকোডে কম্পোজ় করা সফ্‌ট কপি পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠালে কিন্তু গল্পটিকে প্রথমেই ইউনিকোডে কম্পোজ় করেই পাঠাতে হবে।

▶ গল্পের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল/ ফোন নম্বর পাঠানো বাধ্যতামূলক।

▶ গল্পের শব্দসংখ্যা ২০০০-এর মধ্যে রাখাই ভাল।

▶ গল্পটি যেন মৌলিক হয়। অন্য কোনও গল্পের অনুবাদ কিংবা অনুসরণ কিংবা অনুকরণ হলেও চলবে না। এবং কোথাও যেন গল্পটি প্রকাশিত না হয়ে থাকে।

▶ ডাকযোগে গল্প পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১।

▶ গল্প পাঠানোর ইমেল হল: anandamela@abpmail.com

স্কুল ভবনের সামনে শিক্ষিকারা

কম ছাত্রী পঞ্চাশ শতাংশের নীচে নম্বর পায় প্রতি বছর। ছাত্রীরা সংস্কৃতি চর্চাও করে মন দিয়ে। শিক্ষিকারা ছাত্রীদের নাচ, গান, আঁকা, আবৃত্তি শেখান। প্রত্যেক বছর বার্ষিক অনুষ্ঠানের আগে আন্তঃশ্রেণি প্রতিযোগিতা হয়। সব ছাত্রী অংশ নেয়। নাচ, গান, আঁকা, প্রবন্ধ রচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়। স্কুল থেকে কাঁথি টাউন হল ভাড়া নেওয়া হয়। সেখানেই দু'দিন ধরে এই প্রতিযোগিতার আসর বসে। এ ছাড়া স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় ধুমধাম করে। ফুল দিয়ে গোটা স্কুলবাড়ি সাজানো হয়। বর্তমান ছাত্রী, শিক্ষিকাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকেন প্রাক্তনীরাও। এ ছাড়াও রবীন্দ্রজয়ন্তী, সরস্বতী পুজোর সন্ধেয় ছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধে উদ্‌যাপন করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও হয় পড়ুয়াদের নিয়ে।

ছন্দাদেবীর উদ্যোগে স্কুলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি আবক্ষ মূর্তি বসেছে। তাঁর জন্মদিনে ছাত্রী ও শিক্ষিকারা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন।

খেলাধুলোয় পিছিয়ে নেই ছাত্রীরা। প্রতি বছরের শুরুতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। তবে প্রধান শিক্ষিকার আফসোস, স্কুলে বড় ক্যাম্পাস নেই। থাকলে ছাত্রীরা আরও বেশি খেলাধুলোর পরিসর পেত। কিন্তু এই অভাব বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কাঁথির অরবিন্দ স্টেডিয়াম ভাড়া নিয়ে সেখানে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় দু'দিন ধরে। প্রথম দিন পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের খেলা হয়। দ্বিতীয় দিন নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা খেলায় অংশ নেয়। স্কুলের বাইরেও খেলার প্রতিযোগিতায় ছাত্রীরা অংশ নেয়। যোগাসন, ক্যারাটে, কবাডি, খো খো, রিলে রেসে অংশ নিয়ে স্কুলকে বহু পুরস্কার এনে দিয়েছে ছাত্রীরা। সেই ট্রফি সযত্নে সাজানো স্কুলে। তিন ছাত্রী ক্রিকেট খেলায় খুবই ভাল। তারা বাইরে নিয়মিত ক্রিকেটের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এই তিন ছাত্রীকে নিয়ে আশাবাদী প্রধান শিক্ষিকা।

ছাত্রীদের আরও একটি ভাল লাগার বিষয় ওয়ার্ক এডুকেশন, অর্থাৎ কর্মশিক্ষার ক্লাস। প্রযুক্তির যুগে হাতের কাজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। এই কাজটিই ছাত্রীদের যত্ন নিয়ে শিখিয়ে চলেছেন শিক্ষিকারা।

স্কুলের খামতির দিকগুলোও পর্যালোচনা করেছেন প্রধান শিক্ষিকা। স্কুলের পিছন দিকে একটি নির্মীয়মাণ ভবন আছে। আর্থিক সাহায্য পেলে ভবনটি তৈরি করবেন, এমনই ভাবনা ছন্দাদেবীর। ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য ভবনটি রাখার পরিকল্পনা। ইংরেজি পড়ানোর জন্য দক্ষ শিক্ষিকার প্রয়োজন। প্রবীণ শিক্ষিকারা অনেকেই অবসর নেবেন। সেই জায়গায় আরও শিক্ষিকা নিয়োগের কথা ভাবছেন প্রধান শিক্ষিকা। প্রয়োজন আর্থিক সহায়তা। সরকার কিংবা অন্য মাধ্যম থেকে আর্থিক সহায়তা এলে স্কুল সেজে উঠবে। এ ভাবেই নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলেছে পূর্ব মেদিনীপুরের এই স্কুল।

স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

কম্পিউটার ল্যাবে পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি

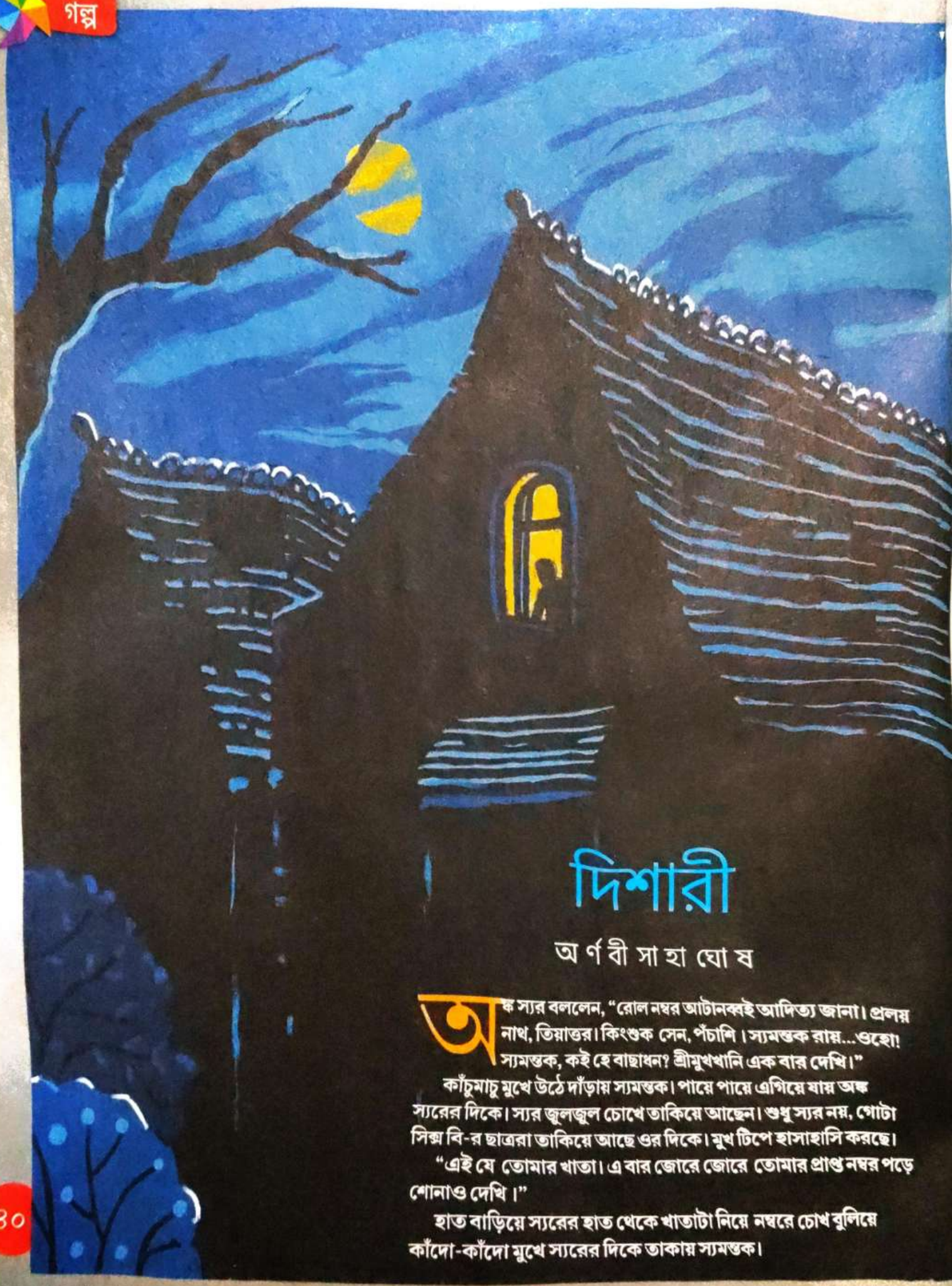

দিশারী

অর্ণবী সাহা ঘোষ

অঙ্ক স্যর বললেন, "রোল নম্বর আটানব্বই আদিত্য জানা। প্রলয় নাথ, তিয়াত্তর। কিংশুক সেন, পঁচাশি। স্যমন্তক রায়...ওহো! স্যমন্তক, কই হে বাছাধন? শ্রীমুখখানি এক বার দেখি।"

কাঁচুমাচু মুখে উঠে দাঁড়ায় স্যমন্তক। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় অঙ্ক স্যরের দিকে। স্যর জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে আছেন। শুধু স্যর নয়, গোটা সিক্স বি-র ছাত্ররা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মুখ টিপে হাসাহাসি করছে।

"এই যে তোমার খাতা। এ বার জোরে জোরে তোমার প্রাপ্ত নম্বর পড়ে শোনাও দেখি।"

হাত বাড়িয়ে স্যরের হাত থেকে খাতাটা নিয়ে নম্বরে চোখ বুলিয়ে কাঁদো-কাঁদো মুখে স্যরের দিকে তাকায় স্যমন্তক।

" কী হল? পড়ো। আচ্ছা আমিই পড়ে দিচ্ছি," স্যমন্তকের হাত থেকে খাতা নিয়ে গলা উঁচিয়ে অঙ্ক স্যর বলেন, "এ বার আমাদের স্যমন্তকবাবু অঙ্কে একশোয় শূন্য পেয়েছেন।"

স্যরের বলার ধরনে ক্লাস সুদ্ধ সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। কান গরম হয়ে ওঠে স্যমন্তকের। স্যর স্যমন্তকের কান মুলে দিতে দিতে বলেন," গত বার একশোয় তিন। এ বার শূন্য। কী করি বল তো তোকে নিয়ে? যা বাইরে গিয়ে নিল ডাউন হয়ে থাক।"

স্যমন্তক তখন অঙ্ক স্যরের ঝুলের মতো ঝুলে পড়া গোঁফের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবছিল। তাই স্যরের কথা কানে ঢোকেনি ওর। ওর কান আরও জোরে মুলে দিতেই ককিয়ে উঠে স্যমন্তক বলে, "আহ! যাচ্ছি যাচ্ছি স্যর।"

নিল ডাউন হয়ে বসে ডেঁয়ো পিঁপড়ের সারির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবে, ওই জল ভর্তি চৌবাচ্চার অঙ্কের উত্তরে যখন দশমিকের পর অত চার এসেছিল, তখনই বোঝা উচিত ছিল। ওই একটি মাত্র চেনা অঙ্ক ও ভুল করে এসেছে। ক্লাস শেষের বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে দেবেশ, নিলয়, অভিব্রত ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে স্যমন্তককে ঘিরে নাচতে থাকে, "শূন্য, শূন্য, শূন্য..."

মুখ ভেংচে উঠে দাঁড়ায় স্যমন্তক, "কী, কী বললি? শূন্য? তোরা কত পেয়েছিস শুনি? আটাশ, পঁচিশ, কুড়ি।"

" তাও তো ওগুলো সংখ্যা। আর তুই তো শূন্য, রসগোল্লা," খিল খিল করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে ওরা।

রাগে, কষ্টে চোখে জল চলে আসে স্যমন্তকের। ঘুষি পাকিয়ে এগিয়ে যায় ওদের দিকে, "মেরে মুখ ফাটিয়ে দেব বলে দিলাম।"

"আয়, গায়ে হাত লাগিয়ে দেখা দেখি।"

স্যমন্তক ঘুষি বাগিয়ে হামলে পড়ে। এলোপাথাড়ি মারধর চলে। অন্য ছাত্ররা টেনে ধরে যখন আলাদা করে ওদের, তত ক্ষণে স্যমন্তকের ঠোঁট গড়িয়ে রক্ত পড়ছে। অন্যদেরও এ-দিক ও-দিক কেটে গেছে।

এক জন মুরুব্বি গোছের ছেলে বলে ওঠে, "তোরা জানিস না, এই স্কুলে মারামারি করার কী শাস্তি? নীচ তলার কোণের ঘরে বন্দি করে রাখে। আর ওই ঘরে যে ঢোকে, সে কোনও দিন ফিরে আসে না। জানিস না তোরা?"

ভয়ে ছিটকে সরে দাঁড়ায় স্যমন্তক। নীচ তলার কোণের ঘরের ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতার সাক্ষী তাকেও হতে হয়েছিল। সে দিন সে বাইরে দাঁড়িয়ে ওই ঘরের দরজায় কান পেতেছিল। অদ্ভুত সব শব্দ আসছিল ভিতর থেকে। মাথার পিছনে চাঁটি দিয়ে অভিরূপ বলেছিল, "পালা, পালা, তোর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেই ওরা তোকে ধরে ঘরের ভিতরে ভরে নেবে।"

ভয়ে ভয়ে স্যমন্তক জিজ্ঞেস করেছিল, "কী আছে এই ঘরে?"

"ভূত," চোখ গোল গোল করে বলেছিল অভিরূপ।

"গত বারের পেরেন্টস-টিচার মিটিংয়ে তোমার বাবার সঙ্গে কথা হয়েছিল। তাঁকে জানিয়েছিলাম, এ বারই তোমাকে শেষ সুযোগ দেওয়া হবে। তুমি শুধু ক্লাসে অমনোযোগী নও, আমার কাছে খবর আছে, হস্টেলেও তুমি গন্ডগোল করছ। আমি তোমার বাবাকে জানিয়েছি। উনি কাল হয়তো এসে পড়বেন। ক্লাস টিচার ও অন্যদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করব, তোমাকে এই স্কুলে আর রাখা যাবে কি না। দেড়শো বছরের পুরনো স্কুল। আজ পর্যন্ত এক জন ছাত্র ফেল করেনি। আমাদের স্কুলের কোনও বদনাম হোক, তা চাই না।"

এত ক্ষণ প্রিন্সিপাল ধীরেনবাবুর সব কথা মাথা নিচু করে শুনছিল স্যমন্তক। এ বার ফোঁটা ফোঁটা জল ভিজিয়ে দিল ওর পায়ের কাছটা। ঠোঁটের আঁশটে নোনতা স্বাদ, বিস্বাদ করে দিচ্ছে ওর মুখের ভিতর।

অঙ্কস্যর মাথায় একটা টোকা মেরে বলেন, "কী তখন থেকে ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদছিস? প্রিন্সিপালের কাছে ক্ষমা চা।"

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্যমন্তক। এক পা-ও নড়ে না।

রাত ন'টা বাজতেই রাতের শেষ ঘণ্টা পড়ে। তার পরে আর কোনও ঘরেই আলো জ্বালানোর নিয়ম নেই। হস্টেল সুপার নিজে এসে দেখে যান, প্রত্যেক ঘরে আলো নিভেছে কি না, কোনও ছাত্র জেগে আছে কি না। আজ রাতেও সুপার এসে ঘুরে ঘুরে দেখে নিলেন, সব ছেলে শুয়ে পড়েছে কি না। ঘরের আলো নিভিয়ে, করিডরের সব আলো নিভিয়ে দিলেন। তার পরে কেটে গেল বেশ কিছু ক্ষণ।

সব ছেলের নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। ঠিক এই মুহূর্তের অপেক্ষা করছিল স্যমন্তক। পা টিপে টিপে ওর ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। করিডরের শেষ মাথায় বুড়ো বিশে ঢুলতে শুরু করেছে তখনই। করিডরের শেষ প্রান্তের ভাঙা জিনিসপত্র রাখার ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল ও। একটু ঠেলতেই দরজাটা আলতো ফাঁক হল। ঘরের ভিতর ঢুকে এসে দাঁড়াল সেই ঘরের অন্য দরজার প্রান্তে। দরজার ছিটকিনিটা আলতো করে নামিয়ে দরজাটা খুলল। হস্টেলের পিছনের দিকের প্যাঁচানো সিঁড়িখানা বেয়ে অতি সন্তর্পণে হস্টেলের পিছনের জঙ্গলে নেমে এল স্যমন্তক।

বেশ ঠান্ডা আজ বাইরে। তাড়াহুড়োয় সোয়েটার আনতে ভুলে গেছে। পাহাড়ের ঢাল ধরে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসে। সামনে নদীর উপর চাঁদের আলো রুপোলি রং ঢালছে। অন্য দিন হলে সে দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের নদীতে কল্পনার জাহাজ ভাসাত। কিন্তু আজ আর কিচ্ছু ভাল লাগছে না। প্রিন্সিপাল স্যর বাবাকে বলে দিয়েছেন, শুধু সামনের সেমিস্টার পর্যন্ত দেখবেন, তার পরেই টিসি। যদিও বাবলু টিফিনের সময় বলেছিল, "ও সব টিসি ফিসি কিচ্ছু না। পাজি ছেলেদের কোণের ঘরে বন্দি করে রাখে। ওটাই শাস্তি।"

" ওই ঘরে কি ভূত আছে রে? অভিরূপ বলেছিল," চোখ সরু করে প্রশ্ন করেছিল স্যমন্তক।

"সে সব জানি না। তবে কিছু তো আছে। ওই ঘরের পিছনের জানলায় একটা ফুটো আছে, দেখবি। অনেকেই ওই ফুটোর ভিতর দিয়ে এই ভরদুপুরে একটা লাল চোখ দেখেছে।"

আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি স্যমন্তক। ভয়ে ওর বুক শুকিয়ে গেছিল। শাল পাতা চেটে স্যমন্তকের পায়ের কাছে ফেলে, গট গট করে ক্লাসে ঢুকে গেছিল

বাবলু। কিন্তু আজ ওর মনটা অন্য কারণে খারাপ। বাবা বলে গেছে, টিসি দিলে এ বার কোনও বোর্ডিংয়ে ভর্তি করে দেবে। যেখান থেকে বাড়ি যেতে দেবে না। পুজোর ছুটিতেও না। কালো অন্ধকারে আটকে রাখবে ওরা। যদিও বাড়ির জন্য আর মন খারাপ করে না ওর। শুধু কাটুর জন্য করে। বাড়িতে গেলে এক মাত্র ও-ই পায়ে পায়ে ঘোরে। ঘেউ ঘেউ করে গায়ের গন্ধ শোকে। বাবা তো সারা দিন ব্যস্ত থাকে। বাড়ি যেতে একদম মন চায় না। বাড়ি গেলে যে মায়ের কথা মনে পড়ে বড্ড। সারা বাড়িতে শুধু মায়ের গন্ধ। গন্ধ আছে, কিন্তু মানুষটা নেই। বাড়ি গেলেই মনে হয় রান্নাঘরে চুড়ির রিন রিন শব্দ তুলে মা গুড়ের পায়েস বানাচ্ছে আর ডাকছে, "সামু আয়, দ্যাখ ক্ষীরের পায়েস বানিয়েছি। তোর মনের মতো।"

স্যমন্তক কত বার রান্নাঘরে ছুটে গেছে, কিন্তু মাকে দেখতে পায়নি। ও জানে আর কোনও দিন মাকে দেখতে পাবে না। দূরের ওই যে তারাটা একটু একটু জ্বলছে, সেই তারার দিকে তাকিয়ে থাকে স্যমন্তক। চোখ জ্বালা করে। গলার কাছে শক্ত হয়ে আসে। ও জানে, মরে গেলে কেউ আকাশের তারা হয় না। কিন্তু ওর ভীষণ মানতে ইচ্ছে করে, ওর মা সত্যিই আকাশের তারা হয়ে গেছে।

তাই তো যে দিন খুব মন খারাপ করে, আর যে দিন খুব খুশি হয়, সেই রাতগুলোয় ঠিক ওই তারাটাই ওর দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে। আজ ওর বড্ড মন খারাপ। ভীষণ অসহায় লাগছে ওর। ওই তারার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে," তুমি তো জানো, আমি অঙ্ক পারি না। অঙ্ক ছাড়াও তো আমি কত কিছু পারি, আঁকতে পারি, আবৃত্তি পারি, তানপুরা বাজিয়ে তাক লাগিয়ে দিই। তবে ওরা কেন বলে মা, আমি অপদার্থ? আমার খুব কষ্ট হয় মা, আমার খুব কষ্ট হয়। নিলয়রা খুব মারে। দ্যাখো, কেমন ঠোঁটটা ফুলে আছে, এখনও ঠিক হয়নি। ও মা, মা, তুমি আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও না মা। এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না মা। আমি তোমার কাছে যাব।"

প্রায় রাতেই স্যমন্তক এসে চুপ করে বসে থাকে এই নদীর পারে। হস্টেলের লোকেরা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি আজ পর্যন্ত। কিছু ক্ষণ নিজের মনে কথা বলে আবার লুকিয়ে ফিরে যায় হস্টেলে। আজ ঠান্ডায় একেবারে জমে যাচ্ছিল ও। তাই আজ আর বেশি ক্ষণ বসে না স্যমন্তক। চোখ মুছে, উঠে দাঁড়িয়ে হস্টেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে লাগল। কিছু দূর এগিয়ে ও আবারও পিছু তাকাল। ওই বিশেষ তারাটিকে যেন বিমর্ষ লাগছে। রাস্তা পার হওয়ার সময় হঠাৎ চোখে পড়ে একটা কাগজ। কাগজের উপর লেখাটা এই অন্ধকারেও কেমন যেন জ্বলজ্বল করছে। সোনালি অক্ষরগুলোর আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারল না স্যমন্তক।

ঝুঁকে পড়ে কাগজটা হাতে নিয়ে লেখাটার উপর চোখ বোলাল, "নাক বরাবর সোজা সাড়ে কুড়ি পা গিয়ে, বাম দিক ঘুরে আরও একচল্লিশ পা।"

বেশ মজা লাগে স্যমন্তকের। ঠিক দু'দিন আগেই রবি ঠাকুরের গুপ্তধন গল্পটা গোগ্রাসে শেষ করেছে। ঠিক এই রকমই জটিল সব ধাঁধা ছিল সে গল্পে। মনে মনে রোমাঞ্চিত হয়, এইটা কি কোনও গুপ্তধনের সূত্র? এটা ধরে এগোলে কেমন হয়? এক বার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে নেয় হস্টেলের দিকে। সুপারের ঘরের আলো নিভে গেছে। আর কিছু না ভেবে, মাথা নিচু করে পা গোনা শুরু করে স্যমন্তক।

" এক, দুই, তিন... চল্লিশ একচল্লিশ," গোনা শেষ করে ঘাড় তুলে তাকিয়ে চমকে ওঠে। আরে, এ তো সেই কোণের ঘর! এত রাতে স্কুলের ভিতর ঢুকল কী ভাবে! স্কুলের দরজা বন্ধ যে থাকে শুধু তা-ই নয়, দরজার বাইরে ভুটু চৌকিদার রোজ রাতে পাহারায় থাকে। পা গোনায় এতটাই মত্ত ছিল ও যে, কখন কী ভাবে স্কুলের ভিতর ঢুকে, এই ভূতুড়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই খেয়াল ওর ছিল না। ভয়ে কাঁপতে থাকে স্যমন্তক। ফিরে যাওয়ার জন্য পিছিয়ে আসতে যাবে, ঠিক সেই সময় ওই ঘরের দরজা হাট হয়ে খুলে গেল। দু'চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইল স্যমন্তক। তার পর আঙুলের ফাঁক দিয়ে এক চোখ টিপে সামনের দিকে তাকায়। তার পর মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে যায় সেই ঘরের দিকে।

"এই স্যমন্তকের কী হয়েছে বল তো! কারও সঙ্গে কথা বলছে না, ঝগড়াঝাঁটি করছে না। ক্লাসেও কেমন চুপচাপ বসে থাকে," স্যমন্তকের দিকে আড় চোখে চেয়ে দেখতে দেখতে বলেছিল নিলয়। অন্য দু'জন ব্যাঙের বিজ্ঞানসম্মত নাম দুলে দুলে মুখস্থ করছিল। দেবেশ পড়া থামিয়ে এক ঝলক স্যমন্তকের দিকে তাকিয়ে বলে, "হুম, সারা ক্ষণ ঘাড় গুঁজে, বইয়ে মুখ ঢুকিয়ে থাকে। আসলে ও বুঝে গেছে এই স্কুলে আর বেশি দিন নেই। কালকেই তো রেজাল্ট। আর এই পরীক্ষায় ফেলু মাস্টার হলেই, বিদায় স্কুল।"

"ওই যে খাবারের বেল পড়ল। চল, ডাইনিংয়ে চল। দেরি করে গেলে কিন্তু চিকেনের লেগ আর থাকবে না।"

পড়া ফেলে উঠে গেল ওরা। কিন্তু স্যমন্তক তখনও মন দিয়ে খাতার উপর কী যেন লিখে চলছে।

"অ্যাই শোন," ডাইনিংয়ে ঢোকার মুখেই বাধা পায় ওরা। ঘুরে দেখে, দেবাশিসদা। ক্লাস টেনের ফার্স্ট বয়। মোটা চশমার কাচের ফাঁক দিয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। পায়ে পায়ে কাছে গেল ওরা,"কী গো?"

"তোদের সেকশনেই একটা ছেলে আছে না? যে সারা দিন ক্লাসের বাইরে নিল ডাউন হয়ে থাকে?"

"তুমি স্যমন্তকের কথা বলছ?"

" হ্যাঁ। ওর কী ব্যাপার বল তো?"

নিলয় নাক চুলকে জিজ্ঞেস করে, "কেন গো? তোমাকে কিছু বলছে ওই বাঁদর?"

" আহ! তা না। দু'দিন আগে দেখি, বারান্দায় দাঁড়িয়ে মন দিয়ে খাতায় কী লিখছে। ওকে মন দিয়ে কোনও দিন লেখাপড়া করতে দেখিনি। তাই ভাবলাম, কী করছে দেখি। উঁকি মেরে দেখলাম, ক্লাস নাইনের একটা উপপাদ্য সল্‌ভ করছে।"

" বলো কী!" ছানাবড়া চোখে তাকায় ওরা।

"আরে, এখানেই শেষ নয়। ওর বোধ হয় ঘুমের মধ্যেও হাঁটার স্বভাব আছে, বুঝলি। তোরা তো জানিস, আমার হস্টেলের রুম থেকে স্কুলের পিছন দিকটা দেখা যায়। কাল বেশ রাতে পড়া সেরে উঠে ও দিকের জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি, ছেলেটা ওই ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভাল করে দেখি, কোথায়! কেউ নেই তো।

ঠিক করে কিছু দেখিনি, তাই কাউকে কিছু জানাতে পারিনি।"

"কী বলছ দেবাদা? ওই ঘরে তো ভূ-ভু-ভূত থাকে," কোনও মতে বলে অভিব্রত। অন্য জনের মুখ দিয়ে কথা সরে না।

"হুম, আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না রে। যাই হোক, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আজ চলি। কিছু জানতে পারলে জানাস।"

ওরা কোনও মতে মাথা নাড়ে।

"শোন, স্যমন্তককে চোখে চোখে রাখতে হবে, বুঝেছিস? আমার মনে হয় কিছু একটা গোলমাল চলছে," গম্ভীর সুরে বলে অভিব্রত।

রাত বেশ গভীর। একটা ছায়ামূর্তি আগে আগে হেঁটে চলেছে। তাকে অনুসরণ করে আরও তিন। প্রথম জন স্কুল গেটের সামনে দাঁড়াতেই খুলে গেল গেটটা। বাকি তিন জন থমকে দাঁড়াল। তার পর আবার প্রথম জনকে অনুসরণ করে চলতে শুরু করল।

"আরে! এই অভি, আর যাস না, মারবি নাকি! চল, ফিরে যাই। কাল প্রিন্সিপাল স্যরকে সব বলে দিলেই হল।"

"না ,আমি দেখতে চাই ব্যাটা মাঝ রাতে কোথায় যায়? তোদের ভয় লাগলে তোরা পালা," অন্ধকারে এ-দিক ও-দিক খুঁজতে খুঁজতে বলে অভিব্রত।

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু যাকে খুঁজছি, সে গেল কোথায়?"

"তা-ই তো, সে গেল কোথায়? ওই দূরে ওই ভূতুড়ে ঘরটার দিক থেকে কেমন আলো ভেসে আসছে দ্যাখ।"

"হ্যাঁ, তা-ই তো! চল গিয়ে দেখি।"

তিন জনে সে দিকে ভয়ে ভয়ে পা ফেলে এগোয়। একটা ঝাঁকড়া কদম গাছ আড়াল করে আছে সামনে। সেই গাছের গুঁড়ির পিছনে লুকিয়ে সামনে তাকায় ওরা। দৃশ্য দেখে পিলে চমকে যায় ওদের। ভাঙা ঘরটার ভাঙা একটা ডেস্কে বসে মন দিয়ে কী যেন লিখছে স্যমন্তক। আর ঠিক ওর সামনের ভাঙা ব্ল্যাকবোর্ডের উপর জটিল সব অঙ্কের ফর্মুলা লেখা হয়ে যাচ্ছে আপনাআপনি। আর-একটু ভাল করে দেখলে বোঝা যায়, সেই ব্ল্যাকবোর্ডের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে আবছায়া এক মূর্তি।

'ওক ওক' শব্দ তুলতে তুলতে চোখ উল্টে, প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ছিল ওরা। ঠিক তখনই বলিষ্ঠ দুই হাত এসে, ওদের শূন্যে ভাসিয়ে ওই ঘরের ভিতর পুরে নিল। ওই ঘরে ঢোকার আগে ওরা স্পষ্ট দেখল, জানলার গরাদে মুখ লাগিয়ে স্যমন্তক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ওরা ঢোকা মাত্রই সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল সেই ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা।

"ক্লাস সিক্স বি-এর চার জনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না স্যর। কাল রাতে হস্টেল থেকে উধাও ওরা।"

সিক্স বি-র ক্লাসটিচার নিত্যানন্দ স্যার প্রায় ফিস ফিস করে প্রিন্সিপালকে জানান কথাটা। ঘরের এক কোনায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে হস্টেল-সুপার।

"সে কী! কী বিপদ! কী নাম তাদের?"

"নিলয় হালদার, অভিব্রত জানা, দেবেশ নাথ আর স্যমন্তক রায়। আরও অদ্ভুত ঘটনা হল, স্যমন্তক এ বারের পরীক্ষায় সব সাবজেক্টে হায়েস্ট মার্কস পেয়েছে।"

"বলছেন কী? তবে তো..."

কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারেন না প্রিন্সিপাল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিত্যানন্দবাবু বলেন, "হ্যাঁ স্যর, বহু বছর বাদে আবার এই ঘটনা। তবে কি অপেক্ষা করব?"

"হুম। সে তো কোনও দিন কারও ক্ষতি করেনি। আর কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করুন।"

"আচ্ছা স্যর।"

ওঁরা ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর প্রিন্সিপাল বীরেনবাবু ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়ান একটা ষোলো-সতেরো বছর বয়সি ছেলের ছবির সামনে। অন্য কৃতী ছাত্রদের পাশে সেই ছবিটার ছেলেটির দুই চোখ একটু বেশি মাত্রায় উজ্জ্বল। চোখ থেকে চশমা খুলে অন্যমনস্ক হয়ে মুছতে থাকেন বীরেনবাবু। সাতাশ বছর আগে এই স্কুলেরই এক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল নীলাদ্রি। প্রত্যেকে ওকে নিয়ে ভীষণ আশাবাদী ছিলেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম হল। তার মধ্যে জেগে উঠল আরও ভাল করার তাগিদ। দিন-রাত এক করে পড়াশোনা করত। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেছিল। সে রাতে স্কুলের ওই ঘরটায় এক গাদা বইয়ের ভিতর মুখ গুঁজে বসে ছিল। আগের দু'রাত ভাল করে ঘুমোয়নি ও। সকলে অনুরোধ করেছিল, হস্টেলে গিয়ে কিছু মুখে দিয়ে আবার এসে বসতে। কিন্তু ওর জেদ, ওই জটিল অঙ্কটার সমাধান যত ক্ষণ না হবে, ও চেয়ার ছেড়ে নড়বে না।

পরের দিন সকালে দরজা খোলার জন্য দারোয়ান এসে দেখেন, ওই ঘরের ডেস্কের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সে। ডাক্তার দেখে বলেছিলেন, অত্যধিক দুশ্চিন্তার কারণে স্ট্রোক। তার পর থেকে যত বার এই স্কুলে অবাধ্য বা কোনও বিষয়ে দুর্বল কেউ পড়তে এসেছে, সেই ছেলেটি অদ্ভুত ভাবে উধাও হয়েছে। ফিরে এসেছে সম্পূর্ণ নতুন ছেলে হয়ে। বীরেনবাবু জানেন, এই স্কুলের বিগত বহু বছরের স্বর্ণাক্ষরে লেখা ফলাফলের পিছনে নীলাদ্রির অবদান ওতপ্রোত জড়িত। সে সব সময় চাইত, তার প্রিয় স্কুল খ্যাতির শিখরে থাকুক। চোখ মোছেন বীরেনবাবু।

বড় একটা মিষ্টির প্যাকেট থেকে বড় বড় মোহনভোগ হাসি মুখে হাতে হাতে তুলে দিচ্ছেন স্যমন্তকের বাবা। আজ তাঁর ভীষণ আনন্দ। স্যমন্তক মাধ্যমিকে সারা রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে। নিলয়, দেবেশ, অভিব্রত সব সাবজেক্টে এ প্লাস। স্যমন্তকের মন আজ খুব খারাপ। বাবা বলেছে, এই স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে কলকাতার কোনও নামী স্কুলে ভর্তি করাবে ওকে। কিন্তু ওর যে যেতে ইচ্ছে করে করছে না। ভাঙা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ও। নিচু স্বরে ডাকল, "নীলাদ্রিদা, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু এই ভাবে থেকো। আমার মতো এলোথেলো মোটা মাথার মানুষগুলোকে মানুষ কোরো। ওদের পাশে থেকো গো। নয়তো খুব কষ্ট হয়। খুব, খুব অসহায় লাগে। আমি আসছি। এক বার শেষ দেখা করবে না?"

কোনও উত্তর আসে না। কদম গাছ থেকে দুটো পাতা ঝরে পড়ে শুধু। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবার দিকে এগিয়ে যায় স্যমন্তক। মনে মনে ভাবে, 'পৃথিবীতে যাদের বেশি ভালবাসি, তাদের হারিয়ে ফেলতে হয় কেন? কেন পারি না তাদের সারা জীবন আঁকড়ে ধরে থাকতে?'

ছবি: বৈশালী সরকার

শব্দসন্ধান

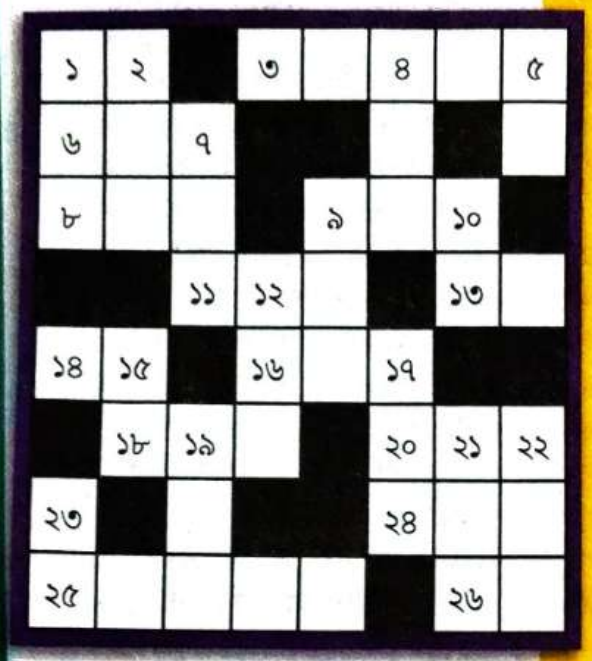

পা শা পা শি

১। বারি, সলিল।
৩। একটি গরমকালের উপাদেয় পদ।
৬। ছোট ছেলে।
৮। ওরফে।
৯। খোঁপা।
১১। হারের মাঝখানে থাকে।
১৩। বাণ।
১৪। পিতা।
১৬। গাড়ি।
১৮। শহর।
২০। যাওয়া।
২৪। আম।
২৫। কলম, পেনসিল যেখানে রাখা হয়।
২৬। তেঁতুল, পাতিলেবু যেমন স্বাদের হয়।

উপর-নীচ

১। উত্তর।
২। মেয়ে।
৪। উৎসব।
৫। কানের নীচের নরম অংশ।
৭। পদ্ম ফুল।
৯। ওড়িশার একটি শহর, যেখানে সুভাষচন্দ্র জন্মেছিলেন।
১০। নিয়ম।
১২। যেটা সিংহের মাথার চার পাশে থাকে, সিংহীর কিন্তু থাকে না।
১৫। বন্যা।
১৭। একটি সাদা গন্ধহীন ফুল।
১৯। উষ্ণ।
২১। রাবড়ি আর সরভাজার জন্য এই গ্রাম বিখ্যাত।
২২। এটি উল্টে দিলেই হিসেব, গণনা বোঝায়।
২৩। কথা।

গত সংখ্যার সমাধান

গ	জা		মা	ন		রা	গ
র		চ	খা		নি		জা
ম	ল	ম		দ	শা	ন	ন
	ট	ক		র		ত	ন
পা	প		ন		শি	শি	
ক	ট	ক	ট		ক	র	দ
ঘ		রী		শি	ল		ম
র	ত		আ	খ		রা	কা

শালুক

ক্লে-র ক্রিসমাস ট্রি

নিজের হাতে

উপকরণ: সবুজ, হলুদ, নীল, কমলা রঙের ক্লে, একটি কাঠি, কাঁচি।

কী ভাবে করবে:

১। সবুজ রঙের ক্লে নিয়ে লম্বা ডিমের আকার দাও। কাঠি ঢুকিয়ে দাও ওর নীচের দিকে।
২। এ বার ছবি দেখে, কাঁচি দিয়ে সবুজ ক্লে ধাপে ধাপে অল্প অল্প করে কেটে নাও। দেখে মনে হবে ঝাউ গাছ।
৩। হাতের চাপে হলুদ ক্লে-কে লম্বা আকার দাও।
৪। নীল ও কমলা রঙের ক্লে হাতে নিয়ে ছোট ছোট গোল্লা পাকিয়ে নাও।
৫। এ বার ঝাউ গাছের গায়ে রঙিন বল লাগিয়ে নাও।
৬। উপর দিয়ে জড়িয়ে নাও হলুদ ক্লে-র দড়ি।
৭। হলুদ ক্লে দিয়ে একটি তারা বানিয়ে কাঠির উপর লাগিয়ে নিলেই তৈরি ক্রিসমাস ট্রি।

ক্লে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, তাই বেশি ক্ষণ ফেলে রাখলে মুশকিল হবে। সে দিকে খেয়াল রেখো।

বৈশালী সরকার

দীপসুন্দর দিন্দা

আনন্দমেলার কুইজ় বিভাগের প্রশ্ন করছেন 'দাদাগিরি আনলিমিটেড সিজ়ন সিক্স'-এর বিজয়ী দীপসুন্দর দিন্দা।

1 বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয় কত তারিখে?

2 অনূর্ধ্ব আট বছর ওয়ার্ল্ড ক্যাডেট চেস চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক জিতলেন কোন ভারতীয়?

দাবাড়ু

8 ২৮০০ এলো রেটিং অর্জন করা দ্বিতীয় ভারতীয় দাবাড়ুর নাম কী?

9 পশ্চিমবঙ্গের কোন শহরকে ডাকা হয় ওলন্দাজ নগরী নামে?

10 আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির সদর দফতর কোন শহরে অবস্থিত?

3 ভারতের প্রথম সংবিধান জাদুঘর খোলা হয়েছে হরিয়ানার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে?

ভারতের সংবিধানের প্রতিলিপি

4 নবম আমুর ফ্যালকন ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হল কোন রাজ্যে?

5 অসমের করিমগঞ্জ জেলার নাম পাল্টে নতুন কী নাম রাখা হল?

6 ভারতের প্রথম গ্রিন হাইড্রোজেন ফুয়েলিং স্টেশন চালু হল কোথায়?

7 ভ্রমণকাহিনি 'পালামৌ' কোন সাহিত্যিকের লেখা?

হাইড্রোজেন জ্বালানি

২০ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

১। দুর্গেশ অরণ্য বন্যপ্রাণী উদ্যান।
২। মালয়েশিয়া।
৩। কাইজ়ার-ই-হিন্দ।
৪। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।
৫। অনীশ সরকার।
৬। তপন সিংহ।
৭। ন্যাশনাল ডিজ়াস্টার রেসপন্স ফোর্স।
৮। চন্দেল রাজবংশ।
৯। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড।
১০। ব্র্যাট।

সঠিক উত্তরদাতা

অনুরূপ বাগচী, *দ্বিতীয় শ্রেণি, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন সেন্টিনারি প্রাইমারি স্কুল।* **সন্দীপ্তা জানা,** *সপ্তম শ্রেণি, সারদেশ্বরী কন্যা বিদ্যাপীঠ, হুগলি।* **সমাদৃত দাস,** *অষ্টম শ্রেণি, গোরাবাজার ঈশ্বরচন্দ্র ইনস্টিটিউশন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।* **সমগ্না ঘোষ,** *তৃতীয় শ্রেণি, মাউন্ট লিটেরা জি স্কুল, পশ্চিম মেদিনীপুর।* **অনিক নাথ,** *সপ্তম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর।* **সৌজন্য সরকার,** *সপ্তম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রহড়া।* **সাম্য চক্রবর্তী,** *অষ্টম শ্রেণি, কাঁচরাপাড়া হানেট হাই স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা।* **আদৃতা গুঁই,** *পঞ্চম শ্রেণি, গুড়াপ বিবেকানন্দ কিন্ডারগার্টেন স্কুল, হুগলি।* **সৌমী সুরাল,** *অষ্টম শ্রেণি, দক্ষিণ জগদ্দল শ্রীমতী কনক বসু বালিকা বিদ্যাপীঠ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।* **সেখ ফালাক,** *পঞ্চম শ্রেণি, খানপুর হাই স্কুল, বাঁশদ্রোণী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।*

উত্তর পাঠাও ১০ জানুয়ারির মধ্যে, anandamelamagazine@gmail.com এই ঠিকানায়।

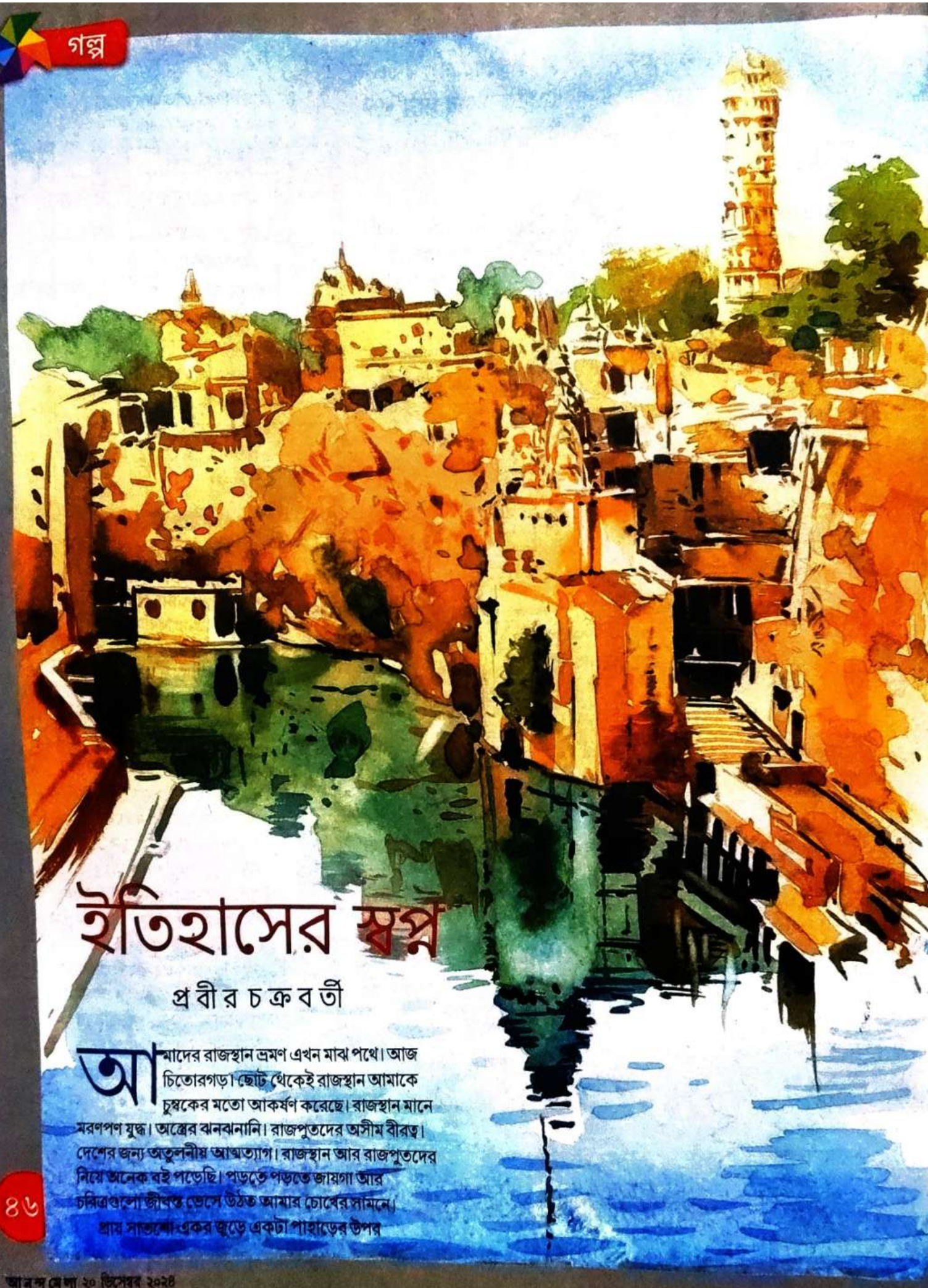

ইতিহাসের স্বপ্ন

প্রবীর চক্রবর্তী

আমাদের রাজস্থান ভ্রমণ এখন মাঝ পথে। আজ চিতোরগড়। ছোট থেকেই রাজস্থান আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছে। রাজস্থান মানে মরণপণ যুদ্ধ। অস্ত্রের ঝনঝনানি। রাজপুতদের অসীম বীরত্ব। দেশের জন্য অতুলনীয় আত্মত্যাগ। রাজস্থান আর রাজপুতদের নিয়ে অনেক বই পড়েছি। পড়তে পড়তে জায়গা আর চরিত্রগুলো জীবন্ত ভেসে উঠত আমার চোখের সামনে।

প্রায় সাতশো একর জুড়ে একটা পাহাড়ের উপর

চিতোরগড় দুর্গ। সম্পূর্ণ এলাকা পাঁচ কিলোমিটার লম্বা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দুর্গ আর পাঁচিল অনেকাংশে ভেঙেচুরে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। চোদ্দোশো বছর বা তারও আগে তৈরি এই দুর্গ। কয়েকশো বছর ধরে মেবারের রাজধানী ছিল স্বমহিমায়। ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির বাদশা আকবরের কাছে পরাজয়ের পর তৎকালীন রানা উদয় সিংহ রাজধানী উদয়পুরে সরিয়ে নিয়ে আসেন। ধীরে ধীরে চিতোরগড় অবহেলিত, পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

হাবুদা বললেন, "দুর্গ ভাঙাচোরা না হলে মানায় না। দেখে গা ছমছম করা অতীতে ফিরে যাব, তবে না দুর্গ!"

হাবুদা ইতিহাসের শিক্ষক। বিষয়টা জানেও খুব ভাল। দুর্গের ভিতরে বৃত্তের আকারে রাস্তা আছে পর্যটকদের দেখার জন্য। আমরা ছ'টা ফটক পার হয়ে সপ্তম ফটক রামপোলে পৌঁছে গেলাম। এটাই প্রধান ফটক। অক্টোবর মাস, অনেক টুরিস্টের ভিড় এখানে। আমরা গাইড পাচ্ছিলাম না। আমাদের টুর-ম্যানেজার এক জনকে খুঁজে নিয়ে এলেন। পরনে ধুতি আর শার্ট। মাঝারি উচ্চতা। রোগা, কালো মানুষটার গলায় পৈতে। রাজপুত ব্রাহ্মণ। নাম শিখরজি। ওঁদের পুরোহিতের বংশ। শিখরজির বয়স হয়েছে। হাঁপানির রোগী। শরীর সামনে ঝুঁকে গেছে। গর্বের সঙ্গে জানালেন, পূর্বপুরুষরা চিতোরেশ্বরী কালীমন্দিরের পুরোহিত ছিলেন।

আমরা শিখরজির সঙ্গে একটার পর-একটা প্রাসাদ, বিভিন্ন মহল দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। শিখরজি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে অনর্গল বলে চলেছেন রাজপুতদের গৌরবময় অতীতের শৌর্য-বীর্যের কথা। আমার মনে হচ্ছিল, সত্যিই যেন অতীতে ফিরে গেছি। রাজস্থানে এসে বেশ কয়েকটা দুর্গ এর মধ্যে দেখে ফেলেছি, কিন্তু ঠিক এ রকম অনুভূতি আগে হয়নি। এ ছাড়াও কেন যেন মনে হচ্ছে, আগেও কোথাও এমন দুর্গ দেখেছি। এর পরে কী আছে, সেটাও যেন আমার জানা।

কিন্তু এখানে তো আমি প্রথম বার এলাম। হয়তো অনেকটা একই রকম দেখতে দুর্গ অন্য কোনও রাজ্যে দেখেছি। ভারতবর্ষে তো দুর্গের অভাব নেই। দুর্গের এক দিকের দেওয়ালে পর পর অনেক গরাদহীন জানলার মতো করা আছে। তখনকার দিনে ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখার ধারণা ছিল না। এর আগেও কোনওখানে ঘুলঘুলি দেখিনি। অনেক ক্ষেত্রে ঘরে বড় একটা দরজা ছাড়া আর কিছু থাকে না। এই গবাক্ষগুলো করা হয়েছে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে শত্রুকে উদ্দেশ্য করে অস্ত্র ছোড়ার জন্য। একটা বেশ বড় গবাক্ষর পাশে এসে শিখরজি দাঁড়ালেন, বাইরে বিশাল মাঠ দেখা যাচ্ছে।

"ইয়ে লড়াই কা ময়দান হ্যায়," বলতে বলতে শিখরজির শীর্ণ বুকটা ফুলে উঠল। এই পথেই শত্রুরা আসত! নিমেষে দেখতে পেলাম বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র। তুমুল চিৎকার করতে করতে হাজার হাজার সৈন্য মরণপণ লড়াই করছে। তেজি ঘোড়ায় চড়ে সৈনিকরা ছুটে যাচ্ছে সামনে। রণহস্তী ক্রুদ্ধ হুঙ্কার করে শত্রুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি বন্দুকের শব্দ, কামানের গর্জন, আহতদের আর্তনাদ, বিজয়ীর উল্লাস।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখলাম শিখরজিরা একটু এগিয়ে গেছেন। ওঁদের ধরতে জোরে হাঁটলাম। নিশ্চয়ই ও সব কল্পনা করছিলাম। কিন্তু কল্পনা এত জীবন্ত হয়! দীপ্তি আমার দিকে লক্ষ রাখছিল। কাছে যেতে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, "যেখানে সেখানে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে পোড়ো না, ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবে কিন্তু!"

দলের এক জন শিখরজিকে বলল, "রাজপুতরা অত বীর হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে বার বার হেরে যেত কেন?"

উত্তর দিল হাবুদা, "প্রথমত, শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকত।"

"কিন্তু ইংরেজরা তো অনেক কম সৈন্য নিয়ে আমাদের হারিয়ে দিত।"

"ঠিকই। ইংরেজদের কাছে উন্নত অস্ত্র, আধুনিক রণকৌশল ছিল, যা আমাদের ছিল না। এ ক্ষেত্রেও তা-ই। মোগলদের কামান-বন্দুক ছিল। যতই পুরনো আমলের হোক, আগ্নেয়াস্ত্র তো বটেই। অন্য দিকে রাজপুতরা ব্যবহার করত চিরাচরিত ঢাল-তরোয়াল, তির-ধনুক। এখানেই পার্থক্য হয়ে যেত। ভারতবর্ষে বাবর, ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। তার পঞ্চাশ বছর পরে হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়েছিল, সেখানেও রানা প্রতাপ সিংহ সেই চিরাচরিত অস্ত্রই ব্যবহার করেছিলেন। অত বছরেও রাজপুতরা আগ্নেয়াস্ত্র রপ্ত করতে পারেনি। তা ছাড়া, রণকৌশলের ক্ষেত্রেও রাজপুতরা মোগলদের থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। ফল যা হওয়ার, তা-ই হল। আকবরের বিশাল কামান-বন্দুকের বাহিনীর কাছে রাজপুতরা হেরে গেল। শুধু বীরত্ব আর প্রাণ বলিদান থেকে জয় আসে না।"

শিখরজিকে মন দিয়ে শুনতে দেখলাম। কোনও প্রতিবাদ করলেন না। অবশ্য বাংলা কথা কতটা বুঝতে পেরেছেন, জানি না। শিখরজি আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গর মতো, দীর্ঘ, দুর্গম পথ দিয়ে আমাদের একটা জায়গায় নিয়ে এলেন। জায়গাটার নাম গৌমুখ। অনেকটা গরুর মুখের মতো দেখতে বলেই হয়তো এই নামকরণ।

শিখরজি গম্ভীর স্বরে বললেন, "এখানে জহরব্রত হত। পরাজয় নিশ্চিত জানলে রাজপুত রমণীরা নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিতেন। তাঁরা মনে করতেন প্রাণের চেয়ে মান অনেক বড়। এখানে তিন বার জহরব্রত হয়েছিল। প্রথম বার দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন। তখন চিতোরের রানা ছিলেন রতন সিংহ। দ্বিতীয় বার গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহ। তখন রানা সঙ্ঘের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বিধবা স্ত্রী রানি কর্ণাবতীর নেতৃত্বে রাজপুতরা যুদ্ধ করেছিল। তৃতীয় আক্রমণ আকবরের। রানা উদয় সিংহের আমলে..."

একটু থেমে আবার বললেন, "বিষপান করে মৃত্যুকে বরণ করেও কোনও কোনও অঞ্চলে ব্রত পালন করা হত। অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হলেও চিতোরের রমণীরা আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিতেন, যাতে শত্রু মৃতদেহর অসম্মান করতে না পারে,"

শিখরজি উপরের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে কপালে ঠেকালেন।

আমি যেন ঘোরের মধ্যে শুনছি শিখরজির কথাগুলো আর উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকাচ্ছি চার দিকে। হঠাৎ বলে উঠলাম, "এখানে একটা জলাশয় ছিল না?"

এ বারও হাবুদা উত্তর দিল। হেসে বলল, "বাহ! আশিস দেখছি রাজস্থান নিয়ে ভাল পড়াশোনা করে এসেছিস। সত্যিই জলাশয় ছিল। একটা প্রস্রবণ থেকে জল আসত এখানে। মহিলারা স্নান করে পবিত্র হয়ে পুজোর মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে আগুনে ঝাঁপ দিতেন। কয়েকশো বছর আগের কথা। কোনও কারণে জল শুকিয়ে গেছে।"

শিখরজি খুব খুশি হলেন, "বিলকুল সাচ বাত। বাঙ্গালি আদমি বহুত ইতিহাস জানতা। বীর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কা মুলুক সে আয়া আপ লোগ।"

দীপ্তি পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। অবাক হয়ে দেখছিল আমাকে। হাবুদা আরও বলল, "জহরব্রত অনুষ্ঠানের পরে পুরুষরাও একটা ব্রত পালন করতেন, তার নাম ছিল 'সাকা'। মৃত পরিজনদের ছাই শরীরে মেখে পুরুষরা রণক্ষেত্রে যেতেন। তারা আর ফিরতেন না। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতেন।"

শিখরজি আরও অনেক জায়গা দেখালেন—পদ্মিনী মহল, কীর্তিস্তম্ভ, চিতোরেশ্বরী কালিকামাতা মন্দির, মীরাবাইয়ের কৃষ্ণমন্দির। আমাদের একটা উঁচু স্তম্ভের কাছে নিয়ে এলেন, "এটাই জয়স্তম্ভ বা টাওয়ার অফ ভিক্ট্রি। প্রায় সাতশো বছর আগে তৈরি হয়েছিল। রানা কুম্ভ মালোয়ার সুলতান মামুদ খিলজিকে হারিয়ে চিতোর পুনরুদ্ধার করলেন। তাঁর স্মারকরূপে গড়ে তুললেন এই জয়স্তম্ভ।"

উঁচু বেদির উপর স্তম্ভটির উচ্চতা সাঁইত্রিশ মিটার। স্তম্ভের দেওয়ালে পুরাণের কাহিনি, ধর্মীয় অনুশাসন, হিন্দু দেব-দেবী আর বিভিন্ন পশুর মূর্তি খোদাই করা আছে। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটু দূরে টাঙানো একটা বোর্ড। তাতে লেখা আছে, 'এখানে ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে তেরো হাজার রাজপুত নারী জহরব্রত করে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন।'

তেরো হাজার! আমার বুকের মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে। হাবুদাও বলেছিল, গৌমুখ কুণ্ডে অত জনের আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতো জায়গা ছিল না। রানিরা করলেও অধিকাংশ সাধারণ রাজপুত মহিলা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরে বাইরের খোলা চাতালে ব্রতপালন করতেন। হঠাৎ এ কী! আমার সামনে বিশাল এলাকা জুড়ে আগুন জ্বলছে। আগুনের লেলিহান শিখা উঠে গেছে অনেক উঁচুতে। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে চার দিক। একের পর-এক মহিলা ঝাঁপিয়ে পড়ছে আগুনে। কেউ চিৎকার করছে, কেউ কাঁদছে।

"আবার দাঁড়িয়ে পড়লে! সবাই অনেক এগিয়ে গেছে," দীপ্তি আমার হাত ধরে টানছে। আমি হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকলাম ওর দিকে। চিৎকার, কান্নার রেশ এখনও যেন কানে বাজছে।

ও উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ লাগছে?"

আমি উত্তর দিলাম না। দীপ্তি আমার হাত ধরে জোরে হাঁটতে লাগল। আমি এখন দীপ্তির হাত ছেড়ে, দলছাড়া হয়ে একা একা হাঁটছি। কোথায় যাচ্ছি, নিজেও ঠিক জানি না। তবে গন্তব্যস্থলে যেতে আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। দুর্গের ভিতরের প্রায় অন্ধকার, গলির মতো রাস্তাগুলোও চিনতে পারছি!

এই তো গৌমুখ! আমি এখানেই আসতে চেয়েছিলাম। কত মানুষ এখানে! সবাই ভীষণ ব্যস্ত, চিৎকার করছে, দৌড়চ্ছে। তুমুল কোলাহলের মধ্যে অনেক দূরে আগুনের শিখা দেখতে পেলাম। আমি আগুনের উৎস লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করলাম। অস্ত্রে সজ্জিত, বিশাল চেহারার একজন পুরুষ আমার পথ রোধ করলেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, "বিজয়! তুমি এত ক্ষণ কোথায় ছিলে?"

'বিজয়! আমার নাম বিজয়! কী আশ্চর্য!' আমিও উত্তর দিলাম, "যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম পিতা।"

তিনি খুব খুশি হলেন। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, "আমি তোমার জন্য গর্বিত পুত্র। তোমার বয়স এখনও পনেরোও পূর্ণ হয়নি। এই বয়সেই তুমি দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছ।"

এক জন সশস্ত্র যোদ্ধা এ দিকে এগিয়ে এলেন। আমি চিনতে পারলাম, আমার কাকা।

"দাদা! এখনই জহরব্রত পালন করার প্রয়োজন ছিল কি? আমি শুনেছি রানি কর্ণাবতী দিল্লির বাদশা হুমায়ুনকে রাখি পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা গ্রহণ করে ভগিনীর বিপদে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন।"

"ঠিকই শুনেছ। কিন্তু তিনি এখন দিল্লিতে নেই। বাংলা অভিযানে গিয়েছিলেন। সংবাদ পেয়ে অভিযান স্থগিত রেখে চিতোরের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। কিন্তু তাঁর আসতে এখনও কিছু দিন দেরি হবে। তত দিন আমরা দুর্গ রক্ষা করতে পারব না। সুলতানের সৈন্যরা চার দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, যে কোনও মুহূর্তে দুর্গের পতন ঘটতে পারে।"

আমি আবার ছুটতে শুরু করেছি। রণক্ষেত্রে যাওয়ার আগে আমাকে ওখানে এক বার যেতেই হবে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে আগুন জ্বলছে। এখানে অসংখ্য মহিলা, বৃদ্ধা থেকে বালিকা সবাই। অল্পবয়সি ছেলেরাও আছে। রমণীরা একে একে জলাশয়ে স্নান করে উঠে পাশের ঘর থেকে ঝলমলে রঙিন শাড়ি পরে বেরিয়ে আসছেন। মুখ চন্দন আর কুমকুমে সজ্জিত। এয়োদের সিঁথি, কপাল জুড়ে সিঁদুর। ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করছেন। কেউ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন। হাহাকার করছেন। আমি হন্যে হয়ে চার দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কী খুঁজছি? কাকে খুঁজছি?

"বিজয়দা," এগারো-বারো বছরের এক জন মেয়ে এসে আমার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভানুমতী! আমি তো এত ক্ষণ একেই খুঁজছিলাম। আমাদের পাশেই থাকে। আমার বোন সুমিত্রার গলায় গলায় বন্ধু। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমাকে বাঁচাও। আমার ভীষণ ভয় করছে। আগুনে পুড়ে মরতে আমি পারব না।"

ভয়ে পায়রার মতো থরথর করে কাঁপছে ভানুমতী। হাসিখুশি মেয়েটাকে এই অবস্থায় দেখে আমি সহ্য করতে পারছি না। ও আমার বোনের মতো।

আমাকে দাদার মতো শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। আমাদের বাড়ির সামনের খোলা জায়গাটায় সারা ক্ষণ খেলা করে ওরা কয়েক জন মিলে।

"ভানু ওঠ, তখন থেকে তোকে খুঁজছি। এত কাঁদছিস কেন?" সুমিত্রা এসে ওকে টেনে তুলল।

ভানু আগের মতোই কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি পারব না, আগুনে ঝাঁপ দিতে পারব না।"

সুমিত্রা কঠিন মুখে বলল, "তোকে পারতেই হবে। আর এক বারও পারব না, কথাটা উচ্চারণ করবি না। শত্রুরা আমাদের ধরে ক্রীতদাসী করে রাখবে। আজীবন অসম্মান, অত্যাচার সহ্য করার থেকে মাথা উঁচু রেখে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া অনেক ভাল। এই মৃত্যু গর্বের, গৌরবের।"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি সহোদরার দিকে। বারো বছরের মেয়েটা এত নির্ভীক, অবিচল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ!

"চল। আর দেরি নয়। আমরা স্নান করে আসি," সুমিত্রা ওকে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

ভানু আর সুমিত্রার গলার শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে আর ওদের দেখতে পাচ্ছি না। আমি বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কয়েক দিন আগেও ওদের দু'জনকে নিয়ে পাশের জঙ্গলে বেড়াতে গেছি। গাছ থেকে বুনোফুল পেড়ে দিয়েছি, ওরা আনন্দে উচ্ছল হয়ে ফুলগুলো মাথায় গুঁজে নিয়েছে। কত গল্প করেছি আমরা, ওদের কথা দিয়েছিলাম দূরের পাহাড়টার গুহা দেখিয়ে আনব শিগগিরি।

পুরোহিত ভাবলেশহীন মুখে মন্ত্র পড়ছেন। শিখরজি!

রমণীরা হাতজোড় করে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। শিখরজি বললেন, "এই মাত্র সংবাদ এসেছে, রানি কর্ণাবতী ব্রত পালন করে মহান মৃত্যুকে বরণ করেছেন। জননীরা! এই বার তোমরা একে একে পবিত্র অগ্নিতে প্রবেশ করো। রাজপুত নারীদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখো।"

কী ভীষণ নির্মম লাগছে শিখরজিকে। একের পর-এক সুকুমারী মাতৃমূর্তি হাতজোড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সুমিত্রা, ভানুমতীও এ বার আগুনের মধ্যে ঢুকে যাবে... আমি ধপ করে বসে পড়লাম মেঝেয়।

"বাবুজি! বাবুজি! আপনি ঠিক আছেন তো? এখানে একা এলেন কী করে? বাইরের কারও তো এই রাস্তা চিনে আসার কথা নয়!" শিখরজির ধাক্কায় সম্বিৎ ফিরল।

"তোর কী হয়েছে আশিস? কত ক্ষণ থেকে পাগলের মতো খুঁজছি আমরা। কোথাও তোকে দেখতে পাচ্ছি না। তার পর এক জন গাইড বলল এ দিকে একা একা এক জনকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে।

"কী করছিলি এখানে?" হাবুদা বলছে কথাগুলো।

পাশে দীপ্তি, আরও কয়েক জন। কাঁদতে কাঁদতে দীপ্তির চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে।

আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো এক বার তাকাচ্ছি শিখরজির দিকে, এক বার আমার স্ত্রী দীপ্তির দিকে...'এত ক্ষণ ধরে যা দেখলাম, সবই কি আমার মনের ভুল?'

ছবি: কুনাল বর্মণ

আমার ছবি

দ্যাখো, ভাবো আর আঁকো

ছবি আঁকতে সবাই ভালবাসে। তাই এই ছবি আঁকার বিভাগ। এখানে আঁকা অসমাপ্ত ছবিটা শেষ করো দেখি। আঁকা শেষ হলে রং করে ফ্যালো ছবিটাকে।

ছবি: কুনাল বর্মণ

চেরুভুভেনাম সানরাইজ ভিউ পয়েন্ট

দক্ষিণের কাশ্মীর লাম্বাসিঙ্গি

অন্ধ্রপ্রদেশের এই গ্রামে নাকি প্রতি দিন দুপুর দুটোর পর বৃষ্টি হয়। শান্ত সুন্দর পাহাড়ি গ্রামটি দক্ষিণ ভারতের একমাত্র স্থান, যেখানে তুষারপাত হয়। লিখেছেন **সুব্রত মুখোপাধ্যায়**

সারা বছর যেখানে কাঠফাটা গরম, সেখানে কাঠফাটা ঠান্ডা শব্দ যেন নিতান্তই বেমানান। কিন্তু জায়গার নামের মানে জানতে গিয়ে অবাক হলাম। সত্যিই সেখানে এমন ঠান্ডা পড়ে? বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ, ডিসেম্বর-জানুয়ারির শীতে কলকাতা যখন জবুথবু, তখন বিশাখাপত্তনম বেশ গরম। ফ্যান বা এসি চালাতে হয়। হায়দরাবাদও তা-ই। তাই বলে সেখান থেকে মাত্র একশো কিলোমিটার দূরে বরফ পড়ে!

শুনতে অবাক লাগলেও লাম্বাসিঙ্গিতে সত্যিই প্রবল শীতে বরফ জমে। সেটা কোথায়? অন্ধ্রপ্রদেশের এক পাহাড়ি গ্রাম লাম্বাসিঙ্গি। তেলুগু এই শব্দের অর্থ কাঠফাটা ঠান্ডা। বিশাখাপত্তনম থেকে একশো এক কিলোমিটার দূরে আল্লুরি সীতারাম রাজু জেলায় অবস্থিত এক পাহাড়ি গ্রাম, যা কোরাবায়ালু নামেও পরিচিত। কোরার অর্থ লাঠি এবং বায়ালুর অর্থ বাইরের অংশ। নামকরণ এই অর্থে যে, কেউ ঘরের বাইরে ঘুমোলে সকালে ঠান্ডায় জমে কাঠের মতো আটকে যাবে। লাম্বাসিঙ্গি গ্রামটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৬০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এখানে সারা বছরই ঠান্ডা থাকে। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তুষারের মতো বৃষ্টি হয় এবং এমনকি বেলা বাড়লেও অনেক ক্ষণ ঠান্ডা বাতাস থাকে। ফলে পর্যটকদের জন্য খুব মনোরম। সে জন্যই পূর্বঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত এই গ্রামকে 'অন্ধ্রপ্রদেশের কাশ্মীর' বলা হয়। ঠিক যেমন দারিংবাড়ি শৈলশহরকে বলা হয় ওড়িশার কাশ্মীর।

বিশাখাপত্তনম থেকে সোজা রাস্তা চলে গেছে লাম্বাসিঙ্গির দিকে। ঢেউখেলানো মালভূমির মতো চার দিক ছাড়িয়ে গাড়ি যখন চড়াই বরাবর উঠতে লাগল, তখন বুঝলাম গন্তব্য আর বেশি দূর নয়। এপথে জনবসতি বেশ কম। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম নজরে পড়ছে। লাল মাটির চাষের জমি আর বেশির ভাগটাই অরণ্য। ঘণ্টা তিনেকের সফর। আরাকু উপত্যকা ঘুরতে গেলে সেখান থেকে পডেরু হয়ে নব্বই কিলোমিটার গেলেই লাম্বাসিঙ্গি। আমি অবশ্য মিল পেয়েছি দার্জিলিংয়ের সঙ্গে। চার দিক কুয়াশাঢাকা পথ। বেলা দশটার আগে এখানে কুয়াশা কাটে না। সবুজ পাহাড়ি উপত্যকায় ঘেরা লাম্বাসিঙ্গিতে সারা বছর কুয়াশায় ঢাকা থাকে। এখানে সারা বছরই মেঘেরা 'গাভীর মতো চরে'। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথের শেষে সুন্দর একটা উপত্যকা। যে দিকে দু'চোখ যায়, শুধু সবুজ সবুজ। আশপাশে রয়েছে বেশ কিছু জলপ্রপাত। সারা বছর প্রচুর সংখ্যক পর্যটক এই স্থানে আসেন। লাম্বাসিঙ্গি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে 'চেরুভুভেনাম' নামে সানরাইজ ভিউ পয়েন্ট রয়েছে। সেখানে পাহাড়ে উঠলে দেখা যায়, চার দিকে পাহাড়ের মাঝে 'তুষার মেঘের পুকুর'। অন্ধ্রপ্রদেশের পর্যটন দফতরের তথ্যমতে, লাম্বাসিঙ্গি হল দক্ষিণ ভারতের একমাত্র স্থান, যেখানে শীতকালে তুষারপাত ঘটে। যদিও প্রকৃতপক্ষে তুষারপাত বলতে যা বোঝায়, তা এখানে ঘটে না।

ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে প্রবল ঠান্ডায় রাতে পড়া শিশির ভোরের দিকে জমে বরফে পরিণত হয়, যা 'গ্রাউন্ড ফ্রস্ট' নামে পরিচিত। শীতকালে প্রবল শীতের কারণে লাম্বাসিঙ্গি 'কোরা বায়ালু' নামে পরিচিত। এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। প্রায় প্রতিদিনই দুপুর দুটোর পর বৃষ্টি হয়। লাম্বাসিঙ্গিকে ইকো-টুরিজম ডেস্টিনেশন হিসেবে গড়ে তুলছে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। চা ও কফি বাগানের জন্য বিখ্যাত হলেও অল্প পরিমাণে আপেল ও স্ট্রবেরিরও চাষ করা হয় এখানে। এক এক জায়গায় এত পরিমাণে কফি বাগান রয়েছে যে, যারা এই অঞ্চলে ঘুরতে আসবে, দেখে তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাবে। লাম্বাসিঙ্গিতে পৌঁছোনোর পথে পড়ে বোদাকোন্ডাম্মা মন্দির। এর আধ কিলোমিটার নীচে একটি প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু জলপ্রপাতও রয়েছে।

থাকার ক্যাম্প

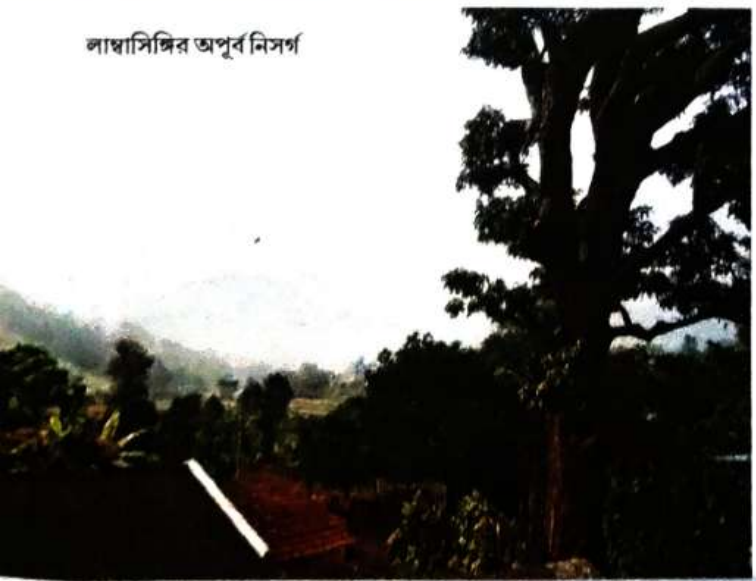
লাম্বাসিঙ্গির অপূর্ব নিসর্গ

লাম্বাসিঙ্গি আদতে আদিবাসীদের গ্রাম। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। মোবাইল পরিষেবাও দুর্বল। বিদ্যুৎ, জলের সমস্যা আছে। তবে ট্রেক করতে যারা ভালবাসে বা প্রকৃতিপ্রেমী, পাখিপ্রেমী, তাদের কাছে একটি নিপাট স্বর্গরাজ্য। শান্ত, নিরিবিলি অথচ উজাড় করা প্রকৃতি এখানে নীরবে অপেক্ষমাণ। লাম্বাসিঙ্গিতে

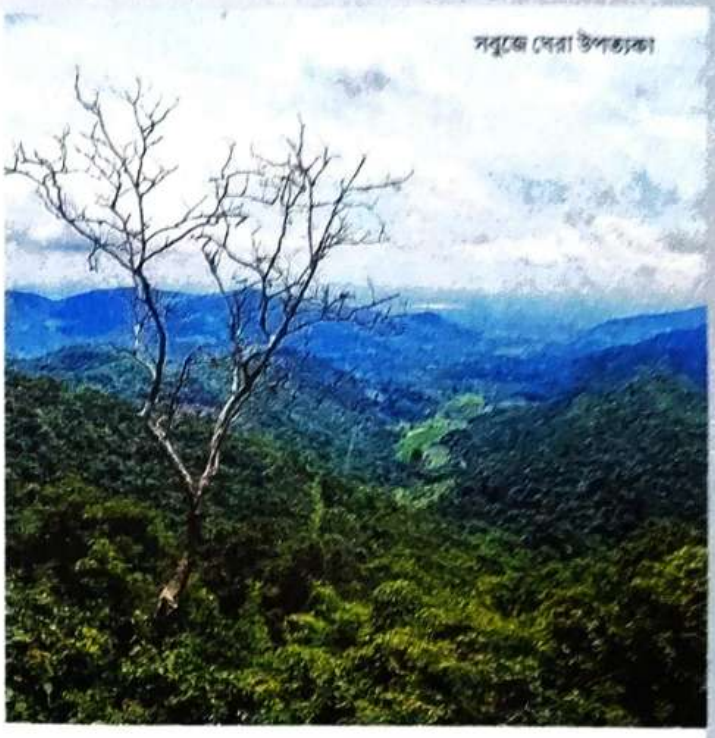
সবুজে ঘেরা উপত্যকা

তাজাঙ্গি জলাধার, কোতাপল্লি জলপ্রপাত, সুসান বাগান, ইয়েরভরম জলপ্রপাত দ্রষ্টব্যের মধ্যে পড়ে। এখান থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে কুয়াশামাখা সবুজ পাহাড়ি উপত্যকা ঘেরা থাজাঙ্গি জলাধার। চার দিকে সবুজের মাঝে টলটলে নীল জলরাশি দেখলে মনে হয় প্রকৃতি তার সব রূপরং ঢেলে দিয়েছে। লাম্বাসিঙ্গি থেকেই বেড়িয়ে আসা যায় বোজ্জান্নাকোন্ডা ও লিঙ্গলাকোন্ডা থেকে। সংঘারাম গ্রামের দু'দিকে দেখা যায় এই দুই পাহাড়। তেলুগু ভাষায় কোন্ডা মানে পাহাড়। ভারতের অন্যতম প্রাচীন বৌদ্ধবিহার বলে পরিচিত এই সংঘারাম গ্রাম। চতুর্থ ও নবম শতকের আমলের বহু বৌদ্ধ স্তূপের খোঁজ মিলেছে এখানে। বোজ্জান্নাকোন্ডা শব্দটির অর্থ তেলুগু ভাষায় 'বুদ্ধের পাহাড়'। পাখিপ্রেমীদের স্বর্গরাজ্য কোন্ডাকারলা পক্ষী অভয়ারণ্যে দেখা মেলে নানান প্রজাতির পাখির। তবে এখানে যেহেতু মোবাইলের পরিষেবা পাওয়ার অসুবিধে আছে, তাই সঙ্গে পর্যাপ্ত টাকা নিয়ে গেলে ভাল। বিশাখাপত্তনম থেকে সড়কপথে লাম্বাসিঙ্গি একশো এক কিলোমিটার, যা যেতে লাগে প্রায় তিন ঘণ্টা। এক দিনেই ঘুরে আসা যায়। খরচ পড়বে হাজার পাঁচেক টাকা। আরাকু ভ্যালি থেকে পডেরু হয়ে নব্বই কিমি গেলে লাম্বাসিঙ্গি। নিকটতম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হল বিশাখাপত্তনম বিমানবন্দর, লাম্বাসিঙ্গি থেকে যার দূরত্ব প্রায় একশো পনেরো কিলোমিটার। রেলপথে লাম্বাসিঙ্গি পৌঁছোনোর সবচেয়ে ভাল উপায় বাহাত্তর কিলোমিটার দূরে আনাকাপোল্লে স্টেশন। সেখান থেকে গাড়িতে লাম্বাসিঙ্গি পৌঁছোনো যায়। লাম্বাসিঙ্গিতে থাকার জন্য এখন অনেক সুন্দর রিসর্ট তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের রিসর্টও রয়েছে এই শৈলশহরে।

ছবি: লেখক

অনেকের ছবি আঁকতে ভাল লাগে। অনেকের ভাল লাগে গল্প, কবিতা, ছড়া লিখতে। তোমাদের যা ইচ্ছে তা লিখে এবং এঁকে পাঠাও। ভাল হলে এই বিভাগে প্রকাশ করা হবে।

আমার ছবি

ময়ূক দত্ত
সপ্তম শ্রেণি, এলিট কো-এড (এইচ এস), বিক্রমনগর, হুগলি।

আমার ছবি

মিত্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
পঞ্চম শ্রেণি, সেক্রেড হার্ট স্কুল, আদ্রা, পুরুলিয়া।

গুনগুন ও শীতপরি

শীতকাল গুনগুনের খুব প্রিয়। এক দিন শীতের দুপুরে কম্বল গায়ে দিয়ে গুনগুন গল্পের বই পড়ছে, এমন সময় তার মনে হল, কানের পাশ দিয়ে কী যেন একটা উড়ে গেল। এ-দিক ও-দিক তাকাতেই দেখতে পেল, বিছানায় ছোট্ট ডানাওয়ালা একটা মানুষ। সে উড়ে গুনগুনের মুখের সামনে এসে বলল, "গুনগুন, আমি তো শীতপরি।" গুনগুন বলল, "তুমি আমার নাম জানো?" "জানি তো... সামনেই তো বড়দিন ... তুমি কি সান্তা ক্লজ়ের দেশে যেতে চাও?" "হ্যাঁ চাই, তুমি নিয়ে যাবে আমাকে?" "তুমি চোখ বন্ধ করে আমার হাতটা ধরো।" গুনগুন তা-ই করল। হঠাৎ সে অনুভব করল, ঠান্ডা হাওয়া তার কানের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তার খুব শীত করতে লাগল। গুনগুন চোখ খুলতেই দেখল, সে শীতপরির হাত ধরে উড়ে যাচ্ছে আর তার চোখের সামনে সব কিছু সাদা বরফে ঢাকা। অনেক ক্ষণ পর তারা নীচে নামল। সেখানে সান্তা ক্লজ় স্লেজগাড়ির মধ্যে উপহার তুলছে। গুনগুনকে দেখে সান্তাদাদু হাত নাড়ল। শীতপরি বলল, "তোমাদের দেশে শীতের তাপমাত্রা বাড়াতেই আমি এসেছিলাম। জানলা দিয়ে তোমাকে দেখে ঘরে ঢুকেছিলাম। এ বার ফিরতে হবে।" "অ্যাই গুনগুন ওঠ! সন্ধে হয়ে গেছে।" মায়ের ডাকে গুনগুন ঘুম থেকে উঠল...তখনই তার মনে হল, কানের পাশ দিয়ে কী যেন একটা ডানা মেলে উড়ে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সুনিস্কা চক্রবর্তী
ষষ্ঠ শ্রেণি, মাউন্ট জ়িয়ন স্কুল, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা।

আমার ছবি

হিরণ ঘাঁটা
অষ্টম শ্রেণি, মাকড়দহ বামাসুন্দরী ইনস্টিটিউশন, মাকড়দহ, হাওড়া।

তোমরা যারা দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ো, তারা এই পাতার জন্য

দস্যি ডেনিস

চুক্তিভঙ্গ

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে ট্রফির সঙ্গে

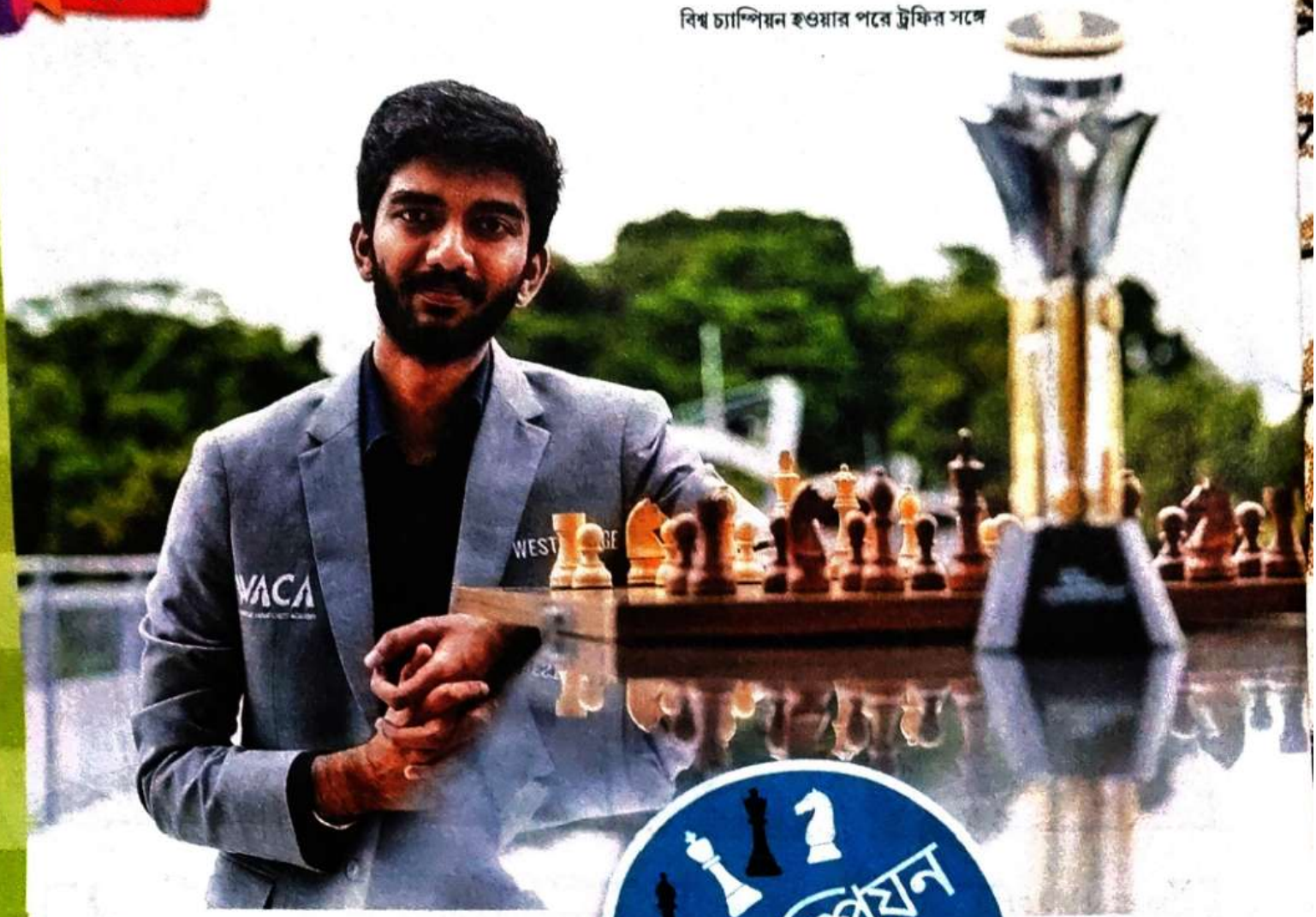

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশ

আঠারো বছর বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে গুকেশ ভাঙলেন ঊনচল্লিশ বছরের পুরনো বিশ্বরেকর্ড। লিখেছেন সায়ক বসু

তাঁর বাবা পেশায় এক জন ডাক্তার, নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ। মা মাইক্রোবায়োলজিস্ট। সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে আর্থিক সমস্যা আসার কথাই না। কিন্তু ২০১৭ -১৮ সালে সেই ডি গুকেশদের পরিবারে টাকার টানাটানি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, সাধের খেলাটির জন্য আত্মীয়দের কাছ থেকে স্পনসর পর্যন্ত নিতে হয়। সম্প্রতি দাবায় চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব অর্জন করার পর এই কথাই জানিয়েছেন তামিলনাড়ুর গুকেশ ডোম্মারাজু বা ডি গুকেশ। ভারতীয় দাবায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তিনি। চিনের ডিং লিরেনকে ৭.৫-৬.৫ পরাস্ত করে তিনি সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব অর্জন করেছেন। তবে গুকেশের এই সাফল্যের পিছনে তাঁর বাবা-মায়ের অবদান অনস্বীকার্য। কারণ, তাঁর বাবাই নিজের কেরিয়ারের কথা চিন্তা না করে সব সময় ছেলের কেরিয়ারের কথা ভেবে গিয়েছেন। তাঁর মায়ের রোজগারেই চলত সংসার। গুকেশের কথায়, "আমরা আর্থিক ভাবে একেবারেই ঠিক জায়গায় ছিলাম না। বাবা-মাকে প্রচুর স্ট্রাগল করতে হয়েছে। ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে আমাদের টাকা-পয়সার এতটাই টান পড়েছিল যে, বাবা-মায়ের বন্ধুরা আমাকে স্পনসর করেছিল। আমার লাইফস্টাইলও ওঁরা বদলেছেন, যাতে আমি টুর্নামেন্ট খেলতে পারি। বাবা-মায়ের এই অবদান কোনও দিন ভুলতে পারব না।" তবে আঠারো বছর বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে গুকেশ শুধু বিশ্বকে

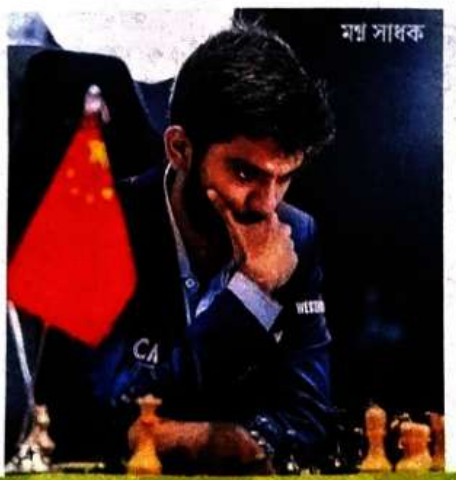

মগ্ন সাধক

তাক লাগিয়ে দেননি, ভেঙেছেন বহু রেকর্ড। বিশ্বনাথন আনন্দের অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা এই খেলোয়াড় ভেঙে দিয়েছেন কিংবদন্তি গ্যারি কাসপারভের রেকর্ড। ১৯৮৫ সালে বাইশ বছর বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন গ্যারি। কিন্তু উনচল্লিশ বছর পরে সেই রেকর্ড ভাঙলেন গুকেশ। সেই যে ছোটবেলায় বাবা-মায়ের কাছ থেকে খেলনা হিসেবে একটা দাবার সেট পেয়েছিলেন গুকেশ, সেটাকেই সঙ্গী করে রেখেছেন আজীবন। প্রথমে নিজের আনন্দে খেলতেন। পরে যখন তাঁর অভিভাবক দেখেন, খেলার প্রতি ছেলের আগ্রহ আছে, তখন তাঁকে ভর্তি করে দেন বিভিন্ন অ্যাকাডেমিতে এবং পরে তাঁর স্বপ্নের নায়ক, বিশ্বনাথন আনন্দের অ্যাকাডেমিতে। সেখান থেকে এই উত্তরণ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পর কেটে গিয়েছে গুকেশের আর্থিক গ্লানি।

গর্বিত বাবা ও মায়ের সঙ্গে গুকেশ

সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত

উৎসবে বিহ্বল

এই ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মোটা অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার জিতেছেন। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় এগারো কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা অর্জন করেছেন। এ বার নিজের রাজ্য থেকে পাচ্ছেন আরও পাঁচ কোটি টাকা। ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই গুকেশের আর্থিক সম্পত্তির পরিমাণ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দাবার সঙ্গে যে তাঁর আর্থিক সম্পর্ক নেই। ভাল দাবাড়ু হওয়ার চেয়েও বেশি গুকেশ যাতে নজর দেন, তা হল ভাল মানুষ হওয়ায়। তিনি বলেন, "মা সব সময় আমাকে একটাই কথা বলেন। গুকেশ এক জন ভাল দাবাড়ু হলে তিনি হয়তো খুশি হবেন। কিন্তু গুকেশ যদি মানুষের মতো মানুষ হতে পারে, তা হলে সেটা ওঁর কাছে গর্বের বিষয় হবে।" এই কথা সব সময় মেনে চলেন গুকেশ। তাই ভাল হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সব সময়, যাতে রেকর্ডের পাশাপাশি তাঁকে সকলে মাটির কাছাকাছি থাকা এক জন মানুষ হিসেবে জানতে পারেন। তবে গুকেশের চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পর এ কথা স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, তাঁর এবং প্রজ্ঞানানন্দর হাত ধরে ভারতীয় দাবা সঠিক হাতেই রয়েছে।

ছোট ছোট খেলা

আমাদের রাজ্য থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটছে খেলাধুলোর নানা ঘটনা। তার ঝলক থাকল এখানে।

হল অফ ফেম-এ শারাপোভা

টেনিসের হল অফ ফেম-এ এ বার ঢুকে পড়লেন প্রাক্তন রুশ টেনিস-সুন্দরী মারিয়া শারাপোভা। বয়স তখন আঠারো বছর। ২০০৫ সালের বিশ্ব ক্রমতালিকায় এক নম্বরে উঠে এসেছিলেন তিনি। আগের বছর ২০০৪ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সে সেরেনা উইলিয়ামসকে হারিয়ে উইম্বলডন জিতে নজর কেড়ে নিয়েছিলেন মারিয়া ইউরিভিনা শারাপোভা। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে টেনিস এরিনা থেকে অবসর নেওয়ার আগে ছত্রিশটি খেতাব জিতেছেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে ৫টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব। দু'টি ফরাসি ওপেনের সঙ্গে একটি করে অস্ট্রেলিয়া ওপেন, উইম্বলডন ও যুক্তরাষ্ট্র ওপেন। অলিম্পিক্স পদকও আছে। বিশ্বের দশ জন মহিলা টেনিস তারকার মধ্যে তিনি এক জন খেলোয়াড়, যিনি কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় করেছেন। তবে ২০১৬ অস্ট্রেলিয়া ওপেনের সময় তিনি নির্বাসিত হন। দীর্ঘ পনেরো মাস টেনিস দুনিয়ার বাইরে কাটাতে হয় তাঁকে। বিশ্ব ক্রমতালিকায় একুশ সপ্তাহ তিনি ছিলেন বিশ্বের এক নম্বর মহিলা টেনিস খেলোয়াড়। আন্তর্জাতিক টেনিস সংস্থার এই সম্মান পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন শারাপোভা।

ফুটবলের গোল্ডেন বয় ইয়ামাল

স্পেনের বার্সেলোনা ক্লাবে নাম লেখানোর পর থেকেই ফুটবল দুনিয়ায় নজর কেড়ে নিচ্ছেন তিনি। ইতিমধ্যে স্পেনের জাতীয় দলের হয়েও নজির গড়ে ফেলেছেন। লামিনে ইয়ামাল এখন যেন বিশ্ব ফুটবলের নয়া বিস্ময়! সদ্য সবচেয়ে কমবয়সি ফুটবলার হিসেবে 'গোল্ডেন বয়' ফুটবলার পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হলেন। এর আগে এত কম বয়সে কোনও ফুটবলার গোল্ডেন বয় পুরস্কার পাননি। ইউরোপের নামী লিগগুলোয় খেলা ২১ বছরের কমবয়সি ফুটবলারদের মধ্যে সেরা খেলোয়াড়টিকে পুরস্কৃত করে ইটালির সংবাদমাধ্যম তুত্তোস্পোর্টস। ইউরোপের পঞ্চাশটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ভোটে ৫০০ পয়েন্টের মধ্যে ৪৮৮ পয়েন্ট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ইয়ামাল। স্পেনের হয়ে এ বারের ইউরোপীয় ফুটবলে দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছেন। সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে জিতেছেন ইউরো কাপ। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের শিরোপাও পেয়েছেন ইয়ামাল। এখনও আঠারো বছরে পা রাখেননি। এ বারের ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের দৌড়েও রয়েছে ইয়ামালের নাম।

খবরে ব্র্যাডম্যানের টুপি

ব্র্যাডম্যান

রং চটে যাওয়া মামুলি একটি টুপি। সেই টুপির নিলামের খবরই সংবাদমাধ্যমে গুরুত্ব পেল। আসলে টুপিটি মামুলি হলেও সেটি এমন এক জন মানুষের, যাঁর নাম ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা ব্যাটার হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি অস্ট্রেলিয়ার স্যর ডন ব্র্যাডম্যান। ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত পাঁচ টেস্ট সিরিজ় খেলতে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। সিরিজ ৪-০-তে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। দুরন্ত ব্যাট করেছিলেন ব্র্যাডম্যান। তাঁর মাথায় ছিল এই ব্যাগি গ্রিন টুপি। ঘরের মাঠে শেষ টেস্ট সিরিজ়ে ওই টুপি পরে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শততম শতরানটি করেছিলেন ব্র্যাডম্যান। নিলামে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয় ব্র্যাডম্যানের সেই টুপি।

জুনিয়র হকিতে ভারত সেরা

ইদানীং হকিতে ভারতের পুরুষ ও মহিলা দল বেশ নজর কাড়ছে। টোকিয়ো অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে প্যারিস অলিম্পিক্সেও ব্রোঞ্জ ধরে রেখেছে ভারতের পুরুষ হকি দল। প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের মেয়েরা যোগ্যতা না পেলেও সদ্য চিনকে ফাইনালে হারিয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে এনেছেন সালিমা-দীপিকারা। এ বার নিয়ে টানা তৃতীয় বার জুনিয়র এশিয়া কাপ হকিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেলল ভারতের পুরুষ জুনিয়র হকি দল। সব মিলিয়ে ভারতীয় জুনিয়র হকি দল এই খেতাব জিতল পাঁচ বার। ভারতীয় দলের প্রাক্তন গোলরক্ষক পি আর সৃজেশ এখন জুনিয়র দলের কোচ। তাঁরই প্রশিক্ষণে ওমানের মাসকাটে জুনিয়র হকিতে সেরা হল ভারতের ছেলেরা। ফাইনালে আরাইজিৎ-দিলরাজ সিংহরা ৫-৩ গোলে হারিয়ে দিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে। ফাইনালে হ্যাটট্রিক-সহ চার গোল করে ম্যাচের নায়ক হয়ে ওঠেন আরাইজিৎ।

জীবনের লড়াইয়ে থামলেন রেডপাথ

ইয়ান রেডপাথ। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার। চলতি মাসের প্রথম দিনটিতে প্রয়াত হলেন তিনি। বয়স হয়েছিল তিরাশি বছর। এই প্রজন্মের কাছে নামটা তত পরিচিত না হলেও হেলমেটবিহীন ক্রিকেটের যুগে টেস্ট ক্রিকেটে ৬৬ টেস্ট ৪৭৩৭ রান করেছিলেন রেডপাথ। আটটি শতরান। তিনিই প্রথম ক্রিকেটার, যিনি ক্রিকেটে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার পান। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে যায় তাঁর নাম। ১৯৭৬ সালে মেলবোর্নে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সেটিই ছিল তাঁর শেষ টেস্ট ম্যাচ। প্রথম ইনিংসে ১০১ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৭০ রান করে দলের জয় সহজ করে দিয়েছিলেন রেডপাথ। ১৯৬৪ সালে অভিষেক টেস্টে মাত্র তিন রানের জন্য শত রান থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি। এর পরে প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকানোর স্বাদ পেয়েছিলেন ১৯৬৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। এক সময়ের সতীর্থ গ্রেগ চ্যাপেল তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "আমার জানা দু'জন ব্যক্তির মধ্যে ইয়ান রেডপাথ এক জন, যিনি অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলকে ধ্বংসস্তূপ থেকে রক্ষা করতে পারতেন, অন্য আর এক জন রডনি মার্শ।"

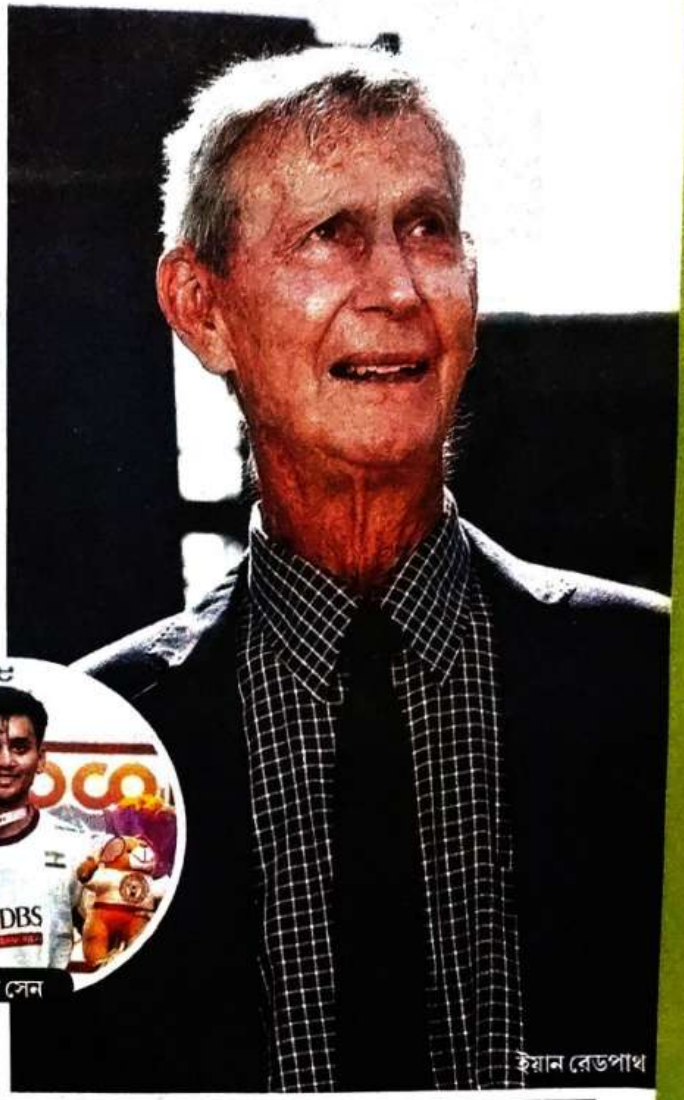
ইয়ান রেডপাথ

লক্ষ্য সেনের লক্ষভেদ

প্যারিস অলিম্পিক্স অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ পদক হাতছাড়া হয়েছিল তাঁর। একেবারে শূন্য হাতে ফিরেছিলেন তিনি। সেমি-ফাইনালে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ডেনমার্কের ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন লক্ষ্য সেন। ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে নেমে মালয়েশিয়ার শাটলার লি জি জিয়াকে প্রথম গেমে হারিয়েও ব্রোঞ্জ পদক লক্ষ্য সেনের কাছে অধরাই থেকে যায়। উত্তরাখণ্ডের তেইশ বছরের এই শাটলার দেশের মাটিতে সৈয়দ মোদী সুপার ৩০০ আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে প্রতিপক্ষ শাটলার জিয়া হেঙ জ্যাকসনকে উড়িয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে নজর কাড়লেন।

লক্ষ্য সেন

স্বপ্ন ছোঁয়ার দৌড়ে তহুরা

প্রতিভাময়ী তহুরা

অ্যাথলেটিক্সে বাংলার সুনাম এখন অনেকটাই তলানিতে। জোর্তিময়ী সিকদার, সরস্বতী সাহা, সোমা বিশ্বাস, স্বপ্না বর্মনদের পর বাংলার কোনও অ্যাথলিটই আর সেই ভাবে দাগ কাটতে পারছেন না। অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমস অনেক দূর—সর্বভারতীয় স্তরেও তেমন সাফল্য কোথায়! এই অবস্থায় স্বপ্ন দেখাচ্ছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙরের প্রত্যন্ত গ্রাম পশ্চিম ধারাপাড়ার ফুলবাড়ির এক প্রান্তিক কৃষক পরিবারের মেয়ে তহুরা খাতুন। ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে সদ্য জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে দু'টি ইভেন্টে নেমে একটিতে সোনা এবং আর একটিতে রুপো জিতে নজর কেড়েছেন তহুরা। অনূর্ধ্ব আঠারো বিভাগে ৪০০ মিটার দৌড়ে ভাঙরের মেয়ে ৫৬.০১ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে সোনা জিতেছেন। ২০০ মিটার দৌড়ে ২৫.০৮ সেকেন্ড সময় করে পেয়েছেন রুপো। বেশ কয়েক বছর ধরে অভাবী ঘরের মেয়েটি রাজ্য ও জাতীয় অ্যাথলেটিক্সে নজর কেড়ে চলেছেন। রাজ্য স্তরে ৪০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে জোড়া সোনা জয়ের কৃতিত্ব আছে তাঁর। ভাগচাষি বাবা, গৃহশিক্ষক দাদা আর মাকে নিয়ে তহুরাদের সংসার। দুই দিদি বিবাহিত। দাদা মীর আলমগীর হোসেন বললেন, অল্প বয়সে তহুরাকে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল, ক্রিকেট খেলতে দিয়ে ভাঙর হাই মাদ্রাসার শিক্ষা বাগবুল ইসলাম অ্যাথলেটিক্সে আগ্রহী করে তোলেন। পরে প্রাক্তন অ্যাথলিট মীরাতুন নাহারের কাছে শুরু হল অ্যাথলেটিক্স শেখা। স্থানীয় ওই মাদ্রাসা থেকে এ বার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবেন তহুরা। সঙ্গে কলকাতা সাই কেন্দ্রে কোচ সঞ্জয় ঘোষের কাছে চলছে নিয়মিত অনুশীলন। স্বপ্ন ছোঁয়ার দৌড়ে নামা তহুরার কথায়, "আমি অলিম্পিক্সে অংশ নিতে চাই।"

চন্দন রুদ্র

নতুন খেলা

১

৩

২

৪

১			
২			
৩			
৪			

ব	র	ব	টি
সু	কু	মা	র
দে	ও	য়া	ল
ব	জ্র	পা	ত

২০ নভেম্বর সংখ্যার সমাধান

ব সু দে ব

ছবিতে শব্দ খোঁজো

চারটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেখে সেগুলোর বাংলা নাম পর পর খোপে লিখে ফ্যালো। এ বার সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হবে একটি বিশেষ শব্দ। শব্দটি তোমাদের পরিচিতই। পেলে খুঁজে?

এ বারের সঙ্কেত: চার দিকে বড় পাতায় ঘেরা পুষ্পাকার কপি।

÷ × + −

Go Figure

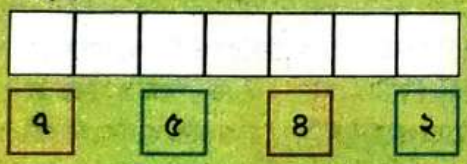

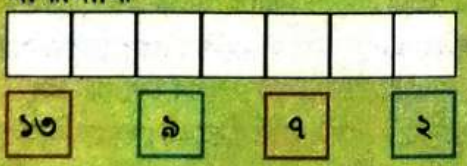

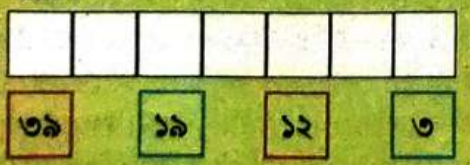

খোপের নীচে দেওয়া চারটি সংখ্যা যেমন খুশি প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম খোপে বসাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যে যে-কোনও চিহ্ন বসাও দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খোপে। যাতে অঙ্কটি কষলে ডান দিকে দেওয়া সংখ্যাটি তার ফল হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করবে। মনে-মনে বন্ধনীও ব্যবহার করতে পার। এই ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে।

সহজ

							= ১০

৭ ৫ ৪ ২

মাঝামাঝি

							= ২৪

১৩ ৯ ৭ ২

কঠিন

							= ৬

৩৯ ১৯ ১২ ৩

২০ নভেম্বর সংখ্যার সমাধান:

সহজ: ৫ + ৯ – (৭ – ৪) = ১১

মাঝারি: (৪২ – ৩৯) × (১১ – ৪) = ২১

কঠিন: (৪৮ ÷ ৬) ÷ (২ × ২) = ২

উপর-নীচ দুটো বিভাগের সঠিক উত্তর ১০ জানুয়ারির মধ্যে anandamelamagazine@gmail.com ঠিকানায় পাঠালে তবেই সঠিক উত্তরদাতা হিসেবে তোমাদের নাম উঠবে।

সমগ্না ঘোষ, তৃতীয় শ্রেণি, মাউন্ট লিটেরা জি স্কুল, পশ্চিম মেদিনীপুর। **অনিক নাথ**, সপ্তম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর। **বিপর্ণিকা সরকার**, পঞ্চম শ্রেণি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর। **সাম্য চক্রবর্তী**, অষ্টম শ্রেণি, কাঁচরাপাড়া হার্নেট হাই স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা। **আদৃতা গুঁই**, পঞ্চম শ্রেণি, গুড়াপ বিবেকানন্দ কিন্ডারগার্টেন স্কুল, হুগলি। **প্রিয়াংশু সাহা**, তৃতীয় শ্রেণি, চন্দননগর শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দির, হুগলি। **তিয়াসা ধবল**, তৃতীয় শ্রেণি, বিশপস প্রাইমারি গার্লস স্কুল, বাঁকুড়া। **সুরাইয়া খাতুন**, সপ্তম শ্রেণি, গজধরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। **সাত্ত্বিক রায়**, পঞ্চম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবন, পশ্চিম মেদিনীপুর। **জিষ্ণুব্রত ভট্টাচার্য**, সপ্তম শ্রেণি, গার্ডেন হাই স্কুল, কলকাতা। **ঈপ্সিতা ভট্টাচার্য**, সপ্তম শ্রেণি, শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, রাজপুর। **অপ্রতিম পাল**, সপ্তম শ্রেণি, পাঠভবন ডানকুনি, হুগলি।

ANANDAMELA 20 DECEMBER 2024 REGISTERED KOL RMS/236/2022 - 2024, RNI NO 27057/75 INR 20.00